পেশাগত ব্যাধি

শ্রীকুমার রায়



পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

বিজ্ঞান পুস্তিকা

পেশাগত ব্যাধি

(OCCUPATIONAL DISEASES)

ডাঃ শ্রীকুমার রায়

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

PESAGATA BYADHI
By Dr. Srikumar Roy

প্রকাশকাল : মার্চ, ১৯৮২

প্রকাশক :
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
আর্য ম্যান্‌সন্‌, নবম তল
৬-এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা ৭০০ ০১৩

মুদ্রক :
অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়
জ্ঞানোদয় প্রেস
৫৫বি, কবি সুকান্ত সরণি
কলিকাতা ৭০০ ০৮৫

প্রচ্ছদ : শ্রীবিমল দাস

Published by Prof. Dibyendu Hota, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board, under the Centrally Sponsored Scheme of production of books and literature in regional languages at the University level of the Government of India in the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture), New Delhi.

উৎসর্গ

তাবৎ খেটে খাওয়া বাঙালীকে

নিবেদন

অস্থি বিদ্যা বেচে দু'চারটে পয়সা রোজগার করে খাই, বই লিখব কোনদিন ভাবতে পারি নি। একদিন দেশ পত্রিকার শ্রীসমরজিৎ কর অনুরোধ করলেন ১৩৮৮ সালের দেশ পত্রিকার (সাহিত্য সংখ্যা) জন্য লেখা চাই এবং লিখতে হবে "পেশাগত ব্যাধির" ওপর। শুনে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল ; পেশার খাতিরে কলকারখানায় আহত কয়েকজন রোগী ইতিপূর্বে দেখেছি, কিন্তু সীমিত জ্ঞান ও সুযোগ সুবিধা নিয়ে তাদের জন্য বিশেষ কিছু করতে পারিনি। তা ছাড়া একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে কয়েক মাস কাজ করে সেখানে শ্রমিক স্বাস্থ্যের প্রতি কর্তৃপক্ষের অবহেলার বহরও দেখেছি। পেশাগত ব্যাধি সম্বন্ধে আমার জ্ঞানের দৌড় ওই পর্য্যন্তই। তাই ছুটলাম হাইজিন ইনস্টিটিউটে, সেখানে COHC-র পূর্বাঞ্চলীয় শাখার ডাঃ পরিমল গাঙ্গুলীর সঙ্গে আলাপ হল, তিনি বহুভাবে সাহায্য করলেন। যথা সময়ে "দেশ" সম্পাদকের কাছ থেকে আমন্ত্রণ লিপি এল, লেখাটি প্রকাশিতও হল। কুঁজোর চিৎ হয়ে শোবার শখ দেখে কয়েকজন বন্ধু অনুকম্পাভরে বললেন ভালই হয়েছে। তারপর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ থেকে লেখাটিকে বর্ধিত আকারে সায়েন্স মনোগ্রাফ হিসেবে প্রকাশের অনুরোধ এল। সমরজিৎ বাবুর "ব্রেন ওয়েভের" এই হল পরিণতি।

এবার লেখার ব্যাপারে সাহায্য পেলাম ডাঃ সমর রায়চৌধুরী, ডাঃ শুভেন্দু ব্যানার্জী এবং বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ডাঃ বিমলেন্দু মিত্রের কাছ থেকে। পর্ষদের মুখ্য প্রশাসন আধিকারিক অধ্যাপক দিব্যেন্দু হোতা এবং অন্যান্য কর্মীরা তাড়াতাড়ি এটা প্রকাশের জন্য অনেক লাল ফিতা বাদ দিয়ে দিয়েছেন, সেজন্য তাঁদের ধন্যবাদ। তা ছাড়া যাঁদের সাহায্য ভোলার নয় তাঁরা হলেন ডাঃ বারিদবরণ ঘোষ, ল্যান্সডাউন আর্ট ষ্টুডিওর বিখ্যাত "ভানুবাবু", উদীয়মান শিল্পী শ্রীঅজয় গুপ্ত এবং আত্মজা শ্রীমতী অনুরাধা।

প্রথম লেখা, তাই দোষ ত্রুটি থাকবেই। সেগুলির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বাধিত হব। আর একটা কথা, বইটিতে বানানের অনেক ভুল বা অসংগতি আছে। ''জানাম্যধর্মং, ন চ মে নিবৃত্তি'' বলা ছাড়া তার আর কোন কৈফিয়ৎ নেই।

১২ই মার্চ, ১৯৮২

অলম ইতি
শ্রীকুমার রায়

পুস্তিকা প্রণয়নে যে সব প্রামাণ্য গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে ঃ

1. Atherley, Gordon R. C.
   Occupational Health & Safety Concepts (1978)
2. Bailey, Hamilton & Love, McNeill
   A Short Practice of Surgery (1962)
3. Gadgil, D.R.
   The Industrial Evolution of India in Recent Times (1973)
4. Gay, Peter & Editors of Time-Life Books
   Age of Enlightment (Great Ages of Man)
5. Hunter, Donald
   The Diseases of Occupation (1975)
6. Kark, Wilfred
   A Synopsis of Cancer (1966)
7. Keele, C.A. & Neill, E. (Rev.)
   Samson Wright's Applied Physiology (1966)
8. Melheush, A.
   Executive Health (1978)
9. Parks, W.R.
   Occupational Lung Disorders (1974)
10. Payling-Wright, G,
    An Introduction to Pathology (1958)
11. Rooke, A. & Wilkinson, D.S.
    Text Book of Dermatology (1972)
12. Schilling, R.S.F. (Ed)
    Occupational Health Practice. (1973)
13. Scott, Bodley (Ed)
    Price's Text Book of the Practice of Medicine. (1978)
14. Wiles, Philips & Wilkinson, R.A.
    Essntials of Orthopaedics.

বিষয় সূচী

ভূমিকা

আজব দেশে অ্যালিসের সঙ্গে এক 'ম্যাড হ্যাটার্'এর আলাপ হয়েছিল। সে অসংলগ্ন কথাবার্তা বলত আর ঘড়ি দেখতে গেলে তার হাত কাঁপত। অ্যালিস পাগল মনে করলেও তার আচার ব্যবহার থেকে মনে হয় আসলে লোকটি ভুগত এক পেশাগত ব্যাধিতে, আজ যাকে আমরা 'হ্যাটার্স্ শেক' বলে জানি। লুইস ক্যারলের সময় টুপি তৈরীর কাজে যাঁরা লিপ্ত থাকতেন তাঁদের পেশাতে মার্কারি নাইট্রেট ব্যবহার করতে হত এবং রোগটি সেই বিষেরই বিলম্বিত প্রতিক্রিয়া। যদিও ব্যাধিটি একটি বৃত্তিরই নামাঙ্কিত, কিন্তু আয়না, থার্মোমিটার, বৈজ্ঞানিক ও ইলেকট্রিক যন্ত্র প্রস্তুতকারক, ফিংগার-প্রিণ্ট বিশেষজ্ঞ, ফটো এনগ্রেভার ইত্যাদি যাঁদেরই পারদ যৌগ নিয়ে কাজ করতে হয়, তাঁদেরই এই রোগ আক্রমণ করতে পারে। চিকিৎসা শাস্ত্রে এরকম আরও অনেক পেশাগত ব্যাধি আছে, সংশ্লিষ্ট বৃত্তির নামেই যাদের পরিচয়। ১ নং তালিকায় তাদের কিছু উদাহরণ দেওয়া হল। প্রকৃতপক্ষে পেশার সঙ্গে পেশাগত ব্যাধির এমনই অঙ্গাঙ্গী ভাব যে স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের শিক্ষক ডাঃ জোসেফ বেল বলতেন 'Nearly every handicraft writes its sign—manual on the hands' (প্রায় প্রতিটি হস্তশিল্পই হাতের ওপর তাদের স্বাক্ষর এঁকে রাখে)। প্রমাণ স্বরূপ তিনি রোগ পর্য্যবেক্ষণ করেই রোগীদের বৃত্তি বলে দিয়ে ছাত্রদের চমকে দিতেন।

হাতের ওপর পেশার ছাপ বা তালিকার উক্ত রোগগুলি ছাড়াও কিন্তু সংখ্যাতীত বৃত্তিজ ব্যাধি আছে। বস্তুত সভ্যতা ও সংস্কৃতির উদ্বর্তনের ফলে মানুষের জীবনযাত্রা যত জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে, তাদের বৃত্তি বা পেশার সংখ্যাও বেড়েছে তদনুপাতে। "জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ" পর্য্যন্ত মানুষ আজ বহু রকম পেশাতে নিযুক্ত এবং দেখা যায় প্রায় প্রত্যেকটি পেশার সঙ্গেই এক বা একাধিক ব্যাধি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জড়িত। অবশ্য তার মানে এই নয় যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্মেষের আগে মানুষের কোন বৃত্তি ছিল না বা তজ্জনিত কোন ব্যাধি দেখা যেত না। তখনকার দিনে মানুষকে খাদ্যসংগ্রহ করতে হত প্রধানত শিকার করে এবং এই পেশাতে

যেমন আঘাত হানতে হয় তেমনি আহত হবার সম্ভাবনাও প্রচুর ; সুতরাং এই আঘাতজনিত আর্তিকে তৎকালীন মানুষের পেশাগত ব্যাধিই বলা উচিত। এছাড়াও হয়ত ফ্লিন্ট্‌স্টোন থেকে পাথরের অস্ত্র তৈরী করত বলে তাদের ফুসফুসে পাথরের গুঁড়ো ঢুকে সিলিকোসিস বা ওই রকম আরও দু-একটি পেশাগত ব্যাধি দেখা যেত। তবে তখনকার দিনে জীবনযাত্রা ছিল সহজ, সরল এবং প্রধান উপজীবিকা বলতে বোঝাত ওই শিকার। কিন্তু আজকের সভ্য মানুষের পেশা অনেক, তাই আজকের দিনে পেশাগত ব্যাধি নিয়ে এত সমস্যা।

প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় জানা গেছে, আজ থেকে প্রায় ১০-২০ লক্ষ বছর আগে বনবাসী পিথেকাস্ বা মহাকপি সম্প্রদায়ের এক গোষ্ঠী সাভানা প্রান্তরবাসী দ্বিপদী মহাকপিতে [নামান্তরে অস্ট্রেলোপিথেকাস আফ্রিকানিস্, Australopithecus Africanis] বিবর্তিত হয়েছিল। এরাই পরে পরিমার্জিত হতে হতে পর্যায়ক্রমে প্রায় ৫ লক্ষ বছর আগে প্রথম মানুষ হোমো ইরেক্টাস, দু-তিন লক্ষ বছর আগে সোয়ান্সকোম্ব এবং স্টেনহেম মানুষ, লক্ষাধিক বছর আগে নিয়ানডারথাল মানুষ এবং অবশেষে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার বছর আগে বর্তমান মনুষ্যাকৃতি ক্রোম্যাগননদের আবির্ভাব। কিন্তু এটি নিতান্তই মানুষের জৈব বিবর্তনের নির্ঘণ্ট। ক্রোম্যাগননদের সঙ্গে বর্তমান মানুষের (হোমো সেপিয়ন্স) একমাত্র পার্থক্য সংস্কৃতিতে এবং এই সাংস্কৃতিক বিবর্তন শুরু হয়েছিল ক্রোম্যাগনন যুগের শেষ কল্পে, আজ থেকে দশ পনের হাজার বছর আগে। বুঝতে অসুবিধে নেই, অস্ট্রেলোপিথেকাস থেকে বর্তমান মানুষে রূপান্তর যদি ঘটে থাকে শনৈঃ শনৈঃ, বিগত দশ হাজার বছরে তার সাংস্কৃতিক বিবর্তন হয়েছে 'শন শন' করে। খাদ্য প্রাণী ডোমেস্টিকেশন (গৃহপালন করা) থেকে শুরু করে, কালটিভেশন (চাষ আবাদ), মেটালাইজেশন (ধাতুশিল্প), বহুরকম বৈজ্ঞানিক ইনভেনশন (আবিষ্কার) শিল্পে রেভল্যুশন (বিপ্লব), জীবনযাত্রার মেকানাইজেশন (যন্ত্রীকরণ) শেষ করে এখন অটোমেশনের (স্বয়ংক্রিয়তা) যুগ। ডোনাল্ড হাণ্টার প্রমুখ বৃত্তিজ ব্যাধির বিশেজ্ঞরা বলেন মানুষের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের প্রায় প্রতিটি ধাপেই কতগুলি পেশাগত ব্যাধি দেখা দিয়েছে। অ্যানথ্রাকস্, ধনুষ্টঙ্কার, ছত্রাক প্রভৃতির ইনফেকশন বা

অ্যানডুলেণ্ট্ জ্বরব্যাধি (Undulent fever), টুলারিমিয়া (Tularaemia), শূকর ব্যাধি (Swine herds disease), ওয়েলস ব্যাধি (Weils disease) প্রভৃতি রোগ যে মানুষের মধ্যে এত ছড়িয়ে গেছে তারজন্য যেমন পশুপালনকে দায়ী করা যায়, তেমনি হুক ওয়ার্ম, সিসটিসারকা প্রভৃতি ইনফেকশন, ডার্মাটাইটিস, বা পাট তুলো খড় ইত্যাদির ধুলো থেকে নানারকম ফুসফুসের ব্যাধি চাষ আবাদেরই প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি। আবার ধাতুযুগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বৃত্তিতে পারদ, সীসা, আর্সেনিক, বিসমাথ, ফসফোরাস প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহারেও মানুষের নানা রকম ধাতুগত বিষক্রিয়া বা মেটাল পয়জনিং দেখা দিয়েছে। অনেক শারীরিক ঝুঁকি নিয়ে ছাপাখানার কম্পোজাররা সীসার টাইপ ঘাঁটাঘাঁটি করেন, শিল্পীরা রেড লেড, হওয়াইট লেড প্রভৃতি রঙ ব্যবহার করেন বা কলকারখানা ও গবেষণাগারে কর্মীরা বিষাক্ত রাসায়নিক যৌগ নিয়ে কাজ করেন। ক্ষতিকারক পদার্থগুলি হয় স্নেহপদার্থে দ্রবীভূত হয়ে চর্মের মাধ্যমে অথবা ধুলার আকারে ভুক্ত বা শ্বসিত হয়ে শরীরে অনুপ্রবেশ করে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে বৃত্তিজ ব্যাধির আলোচনা করলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এগুলি মনুষ্য প্রজাতির প্রতিবর্তন বা ডেভোল্যুশনের অন্যতম নির্দেশক; প্রাণী জগতে একমাত্র মানুষই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অধিকারী বলেই তাদের পেশা এবং তৎসংক্রান্ত ব্যাধির সমস্যা। সুতরাং সঙ্গত কারণেই আজকাল একটা প্রশ্ন দার্শনিকদের চিন্তিত করেছে, মনুষ্য জীবনের কৃত্রিম নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য কিনা। অপরিহার্য হোক, না হোক, আজকেরে দিনে বিজ্ঞান মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে এগিয়ে চলেছে। এবং একথাও সত্য যে বিজ্ঞানই মানুষকে পেশাগত ব্যাধিগুলি প্রতিরোধ ও প্রতিকারের ক্ষমতা দিয়েছে। তা না হলে এতদিনে ক্যান্সার, নিউমোকোনিওসিস ইত্যাদি মারাত্মক রোগে হোমো-সেপিয়ন্স প্রজাতির অবলুপ্তি ঘটত। অথচ অবলুপ্তি তো দূরের কথা, দেখা যাচ্ছে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের সঙ্গে তুলনা করলে বর্তমান মানুষের গড় জীবৎকাল বেড়েছে, মৃত্যুর হার কমে গেছে। অস্ট্রেলোপিথেকাসরা বাঁচত গড়ে ২০ বছর, আজকের মানুষ ৭০ বছর। ফলে পৃথিবীতে বৃদ্ধের সংখ্যা এবং সাধারণ ভাবে জনসংখ্যা এত দ্রুত হারে বাড়ছে যে ব্যাধির পরিবর্তে এটাই হয়ত

একবিংশ শতাব্দীর বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিতে পারে। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ই. এস. ডিভির মতে সারা পৃথিবীর অস্ট্রেলোপিথেকাসের সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ, হোমো ইরেকটাসের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১০ লক্ষ, ক্রোম্যাগননদের ৩০ লক্ষ এবং অনুমান করা যাচ্ছে বিংশ শতাব্দীর শেষে হোমো সেপিয়ন্সদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে সাড়ে ছ-শ' কোটি, সুতরাং সামগ্রিক ভাবে বিজ্ঞান যে অন্যান্য ব্যাধির সঙ্গে বৃত্তিজ ব্যাধির সমস্যারও মোকাবিলা করতে কিছুটা সক্ষম হয়েছে এটা তার প্রমাণ হিসেবে ধরা যেতে পারে।

বিজ্ঞানের কাছে সমস্যার চেয়েও সমাধানের চ্যালেঞ্জটাই বড়। পেশাগত ব্যাধি সম্বন্ধেও বিংশ শতাব্দীর জীবনদর্শন বিখ্যাত বৃত্তিজ ব্যাধি বিশেষজ্ঞ ডাঃ রবারটস মারের উক্তিতে সুন্দর ফুটে উঠেছে ঃ

'It is perhaps a pity that in an increasing'y technological society attention tends to be directed towards the dangers rather than to the necessities or advantages of work, but it is only by study of the dangers that measures can be taken to make work safe, healthy and satisfying.' (আফশোসের কথা এই যে, ক্রমবর্দ্ধমান প্রযুক্তিনির্ভর সমাজে শ্রমের প্রয়োজনীয়তা বা উপকারীতার চেয়ে এর কুফলগুলির প্রতি মনঃসংযোগের প্রবণতা বেশী দেখা যায়, কিন্তু একমাত্র এই বিপদগুলি পর্য্যালোচনা করলেই পেশাকে নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত এবং তৃপ্তিদায়ক করা সম্ভব।)

১নং তালিকা ঃ পেশার নামাঙ্কিত কয়েকটি ব্যাধি

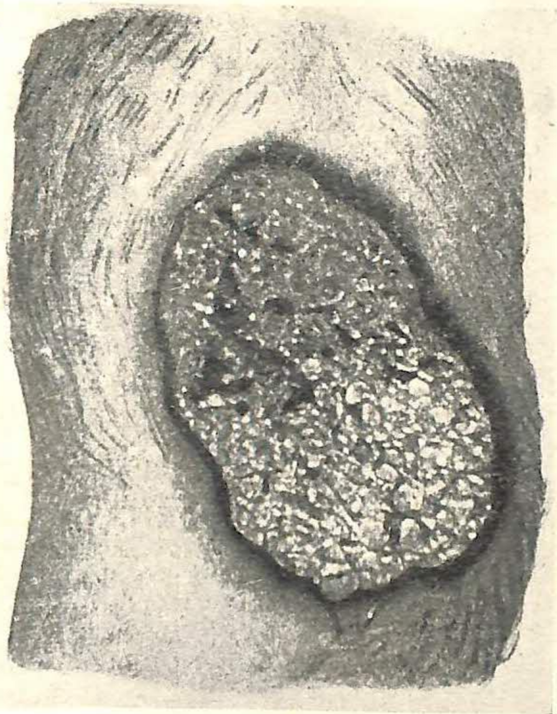
(ব্যাধির নাম, সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

Butcher's Wart (কসাই এর আঁচিল)

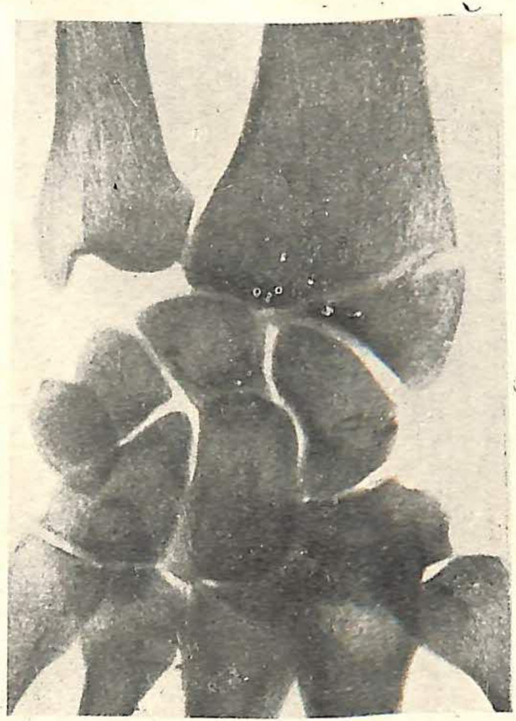
কসাইরা অনেকসময় টিবি রোগাক্রান্ত পশুমাংস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে, ফলে তাদের হাতে একরকম আঁচিল দেখা যায়।

Chauffer's Fracture (মোটর চালকের ফ্র্যাকচার)

মোটর গাড়ির ইঞ্জিনের কমপ্রেশন কম থাকলে হ্যাণ্ডেল মারবার সময়



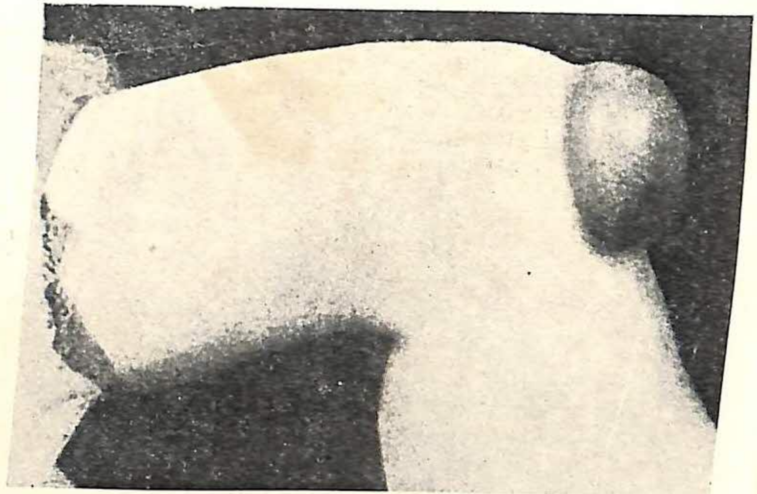
চিত্র 1 : টি. বি. জীবাণুর আক্রমণে কসাইয়ের হাতে আঁচিল।



চিত্র 2 : মোটর চালকের রেডিয়াস অস্থি ভেঙ্গে গেছে।



চিত্র 3 : মেছুড়েদের হাতে
এরিসিপেলয়েড ব্যাধি



চিত্র 4 : গৃহ-পরিচারিকার হাঁটুর সামনের বারসা
ফুলে উঠেছে।

অনেক ক্ষেত্রে সেটি ঘুরে এসে কব্জিতে আঘাত ক'রে এক বিশেষভাবে সেখানকার হাড় ভেঙ্গে দেয়।

Chimney Sweeper's Cancer
(চিমনি পরিষ্কারকদের ক্যান্সার)

কারখানা বা বাড়ির চিমনি পরিষ্কার করার সময় শ্রমিকরা আগে তার মধ্যে উঠে কাজ করত। ফলে ঐ উপজীবীদের চামড়ায় ভুসো লেগে ক্যান্সার দেখা দিত। পরে আইন করে চিমনির মধ্যে ওঠা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

Clay Shovler's Fracture (মাটি কাটা পেশায় ফ্র্যাকচার)

কোদাল বা বেলচা ইত্যাদি দিয়ে যাঁরা মাটি ইত্যাদি তুলে থাকেন, টান লেগে তাঁদের গলার ৭নং কশেরু ভেঙ্গে যাবার সম্ভাবনা।

Clergyman's Sore Throat (যাজকদের গলার রোগ)

ধর্মযাজকদের মধ্যে গ্র্যানুলার ফেরিনজাইটিস প্রায় দেখা যায়।

Diver's Palsy (ডুবুরীর পক্ষাঘাত)

গভীর সমুদ্রে ডুবুরী নামাবার সময় তাঁদের ক্যাপসুলে বায়ুর চাপ বৃদ্ধি করা থাকে। পরে এঁরা যখন হঠাৎ সাধারণ বায়ুচাপে পুনঃ প্রবেশ করেন, এঁদের সুষুম্নাকাণ্ডে গ্যাসের বুদবুদ বেরিয়ে পক্ষাঘাত সৃষ্টি করে।

Fireman's Cramp (দমকল শ্রমিকদের পেশীটান)

দমকল কর্মী বা পুলিসদের মধ্যে এই রোগ দেখা যায়। গরমে অতিরিক্ত ঘর্ম নিঃসরণের ফলে শরীর থেকে লবণ পদার্থ বেরিয়ে গিয়ে এই রোগ সৃষ্টি করে।

Fish Handler's Disease (মেছুড়ের ব্যাধি)

মেছুড়েদের হাতে মাছের কাঁটা বা আঁশ ফুটে এরিসিপেলয়েড (Eerysipeloid) নামে এক রকম রোগ দেখা যায়।

Footballer's Injury (ফুটবল খেলোয়াড়ের আঘাত)

ফুটবল খেলাটা আজ অনেক খেলোয়াড়ের পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। খেলার সময় হাঁটু মুচড়ে সেখানকার কার্টিলেজ ছিঁড়ে যেতে পারে। এর ফলে অনেক বিখ্যাত খেলোয়াড়কেই অকালে অবসর নিতে হয়েছে।

Glass Blower's Disease (কাচে ফুঁ দেওয়া জনিত ব্যাধি)

ফুঁ দিয়ে কাঁচের গোলক ইত্যাদি তৈরীর সময় চাপ লেগে প্যারটিড (Parotid) লালাগ্রন্থিতে প্রদাহ দেখা দেবার সম্ভাবনা।

Housemaid's Knee (গৃহ পরিচারিকার জানু)

বিলেতের গৃহপরিচারিকারা হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে বসে ঘর পরিষ্কারে অভ্যস্ত। তাদের মালাইচাকির ওপরের বার্সা (bursa) মোটা হয়ে যায়।

March Foot (কুচকাওয়াজী পা)

সৈন্য বা পিওন প্রভৃতি পেশায় এক নাগাড়ে বহুক্ষণ হাঁটতে হয় বলে তাদের মেটাটারসাল (metatarsal) হাড়ে সূক্ষ্ম চিড় ধরে।

Miner's Anaemia (খনি শ্রমিকদের রক্তাল্পতা)

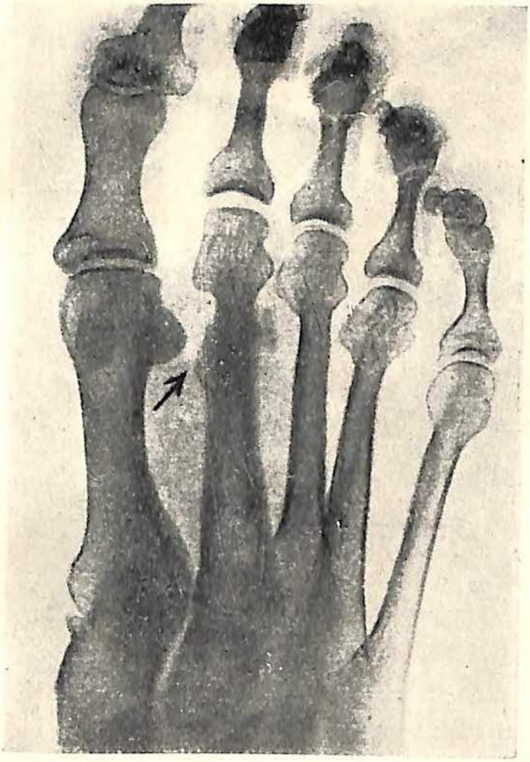
খনি শ্রমিক বা চাষীদের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব। হুক ওয়ার্ম ইন্‌ফেকশন এর কারণ।

Mule Spinner's Cancer (মিউল স্পিনারদের ক্যানসার)

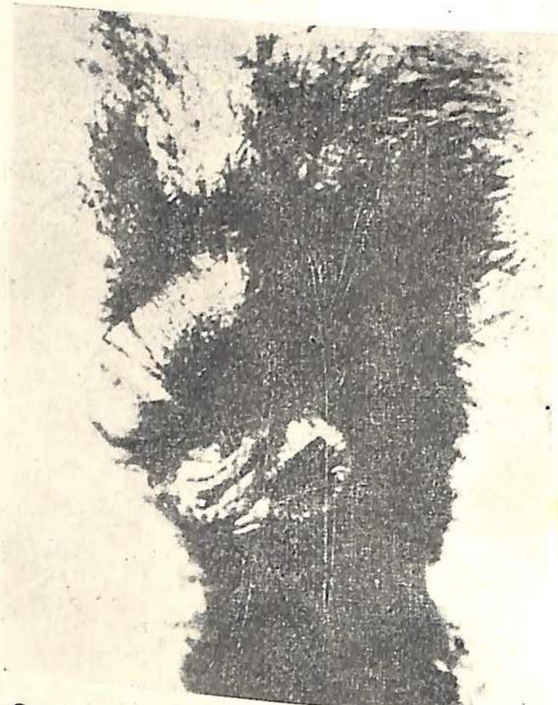
এক সময় বিলেতের কাপড়ের কলগুলিতে যে মেশিন তৈল ব্যবহার করা হত সেটি ওই সব কারখানার শ্রমিকদের চামড়ার সংস্পর্শে আসতে আসতে ক্যান্সার দেখা দিত।

Paddy Field Foot (ধানচাষীর পা)

বর্ষায় ধান রোপনের সময় চাষীদের জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে অনেকক্ষণ থাকতে হয়। ফলে তাদের পায়ের ছাল উঠে যায়, পা ফুলে যায়, নীল হয়ে



চিত্র 5 : কুচকাওয়াজী পা, একস-রেতে দেখা যাচ্ছে
পায়ের মেটাটারসাল হাড়ে চিড় ধরেছে।



চিত্র 6 : মিউল-স্পিনারের অণ্ডথলিতে ক্যান্সার ক্ষত।

যায়। ট্রেঞ্চে যে সব সৈন্য অনেকক্ষণ থাকে বা যে সব জাহাজের নাবিক অনেকক্ষণ ভিজে পায়ে থাকে তাদেরও এ রোগ হতে পারে।

Singer's Node (গায়কের নোড)

গায়ক বা পেশাদার বক্তাদের স্বননযন্ত্রের ভোকাল কর্ডে একরকম টিউমার হয়।

Soldier's Heart (সৈনিকের হৃদ্‌রোগ)

যুদ্ধের সময় অনেকক্ষেত্রে অর্ধশিক্ষিত বা প্রশিক্ষণ বিবর্জিত সৈন্যদের যুদ্ধে পাঠান হয়। তাদের মধ্যে মানসিক কারণে বুক ধড়ফড়ানি ইত্যাদি হৃদ্‌রোগ দেখা যায়।

Student's Elbow (ছাত্রদের কনুই)

ছাত্রদের মত লেখাই যাঁদের পেশা তাঁদের কনুইয়ের ওপরকার বারসা (bursa)-য় প্রদাহ দেখা দিতে পারে।

Tennis Elbow (টেনিস খেলোয়াড়ের কনুই)

টেনিস খেলোয়াড়, নৃত্যশিক্ষক প্রভৃতি যে সব পেশায় সব সময় হাত ঘোরাতে হয় বা কনুই ভাঁজ করতে হয় তাদের কনুই-এর বহির্দেশে যন্ত্রণা হতে পারে।

Weaver's Bottom (তাঁতির নিতম্ব)

তাঁতীদের অনেকসময় একনাগাড়ে বসে কাজ করতে হয়। ফলে তাঁদের শ্রোণী অস্থি-র ইসকিয়াল টিউবেরসিটি (Ischeal tuberosity)-র ওপরকার বারসা (bursa)-য় প্রদাহ দেখা দেবার সম্ভাবনা।

Wool Sorter's Disease (পশম বাছাইকারকের ব্যাধি)

যারা উল বেছে শ্রেণী বিভাগ করেন বা উল নিয়ে প্রায়ই ঘাঁটাঘাঁটি করেন তাদের ফুসফুসে অ্যানথ্রাক্স ইনফেকশন হবার সম্ভাবনা।

Writer's Cramp (লেখকের পেশীটান)

লিখতে লিখতে অনেক সময় হাত অবশ হয়ে পড়ে বা ভেরে যায়, হাতের পেশীতে টান ধরে। ব্যাপারটা কিন্তু মোটামুটি মানসিক।

ঐতিহাসিক পর্য্যালোচনা

বর্তমানে মানুষের সংখ্যাতীত পেশা নিঃসন্দেহে সভ্যতারই অবদান। উন্মেষের উষালগ্ন থেকে শুরু করে সভ্যতা যত এগিয়েছে তার সঙ্গে সংগতি রেখে পেশার সংখ্যাও বেড়েছে চক্রবৃদ্ধিহারে, একের প্রয়োজনে সৃষ্টি হয়েছে একাধিক পেশা। অবশ্য এরই মধ্যে দু একটা যে কালক্রমে অবলুপ্ত হয়ে যায় নি বা যাচ্ছে না তা নয়। এঙ্গেলস্ প্রমুখ মনীষীরা একমত যে আজ থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগে মানুষের জীবনে এমন দুটি ঘটনা যুগপৎ ঘটে যায় যার ফলে পশুতুল্য মানুষ একলাফে সভ্য মানুষে উত্তীর্ণ হল। এর মধ্যে প্রথম এবং প্রধান চাষ পদ্ধতির আবিষ্কার এবং দ্বিতীয়টি বন্য পশুকে গৃহে পালন। আশ্চর্য্য, দুটিই শুরু হয়েছিল একই ভৌগোলিক পরিবেশে, মধ্য প্রাচ্যে। এই ঘটনাদ্বয়ের অব্যবহিত আগে মানুষের উপজীবিকা ছিল যাযাবর বৃত্তি, ইংরাজিতে যাকে বলা হয় "Hunter Gatherer"। আজও ল্যাপ, বথ্‌তিয়ারী, টোডা প্রভৃতি মুষ্টিমেয় কয়েকটি উপজাতি সেই ফেলে আসা জীবনের স্মৃতি বহন করে প্রায় অবলুপ্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, উত্তরণের মহাযজ্ঞে সামিল হতে পারেনি। এদের দেখে অনুমান করা যায় যে নিয়ানডারথাল বা ক্রোম্যাগননদের একমাত্র পেশা ছিল পশুদের পশ্চাদ্ধাবন, তাও নির্ভর করত প্রকৃতির খেয়ালের ওপর।

চাষ পদ্ধতির আবিষ্কার এবং বন্যপশুকে গৃহে বন্দী করে মানুষের জীবনে স্থিতি এল, তার সঙ্গে প্রগতি। প্রয়োজন দেখা দিল নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কারের। যে কাস্তে প্রস্তর যুগের লোকেরা ব্যবহার করত সাধারণ ছেদক হিসাবে তা দিয়ে ধান গাছ কাটা সম্ভব নয়, আঘাতে শীষ ঝরে পড়বে। সুতরাং মানুষ আবিষ্কার করল করাতের মত ধারওয়ালা কাস্তে; ক্রমশ এল কোদাল, এল লাঙল। পাথর বা জীবজন্তুর হাড় দিয়ে এত সূক্ষ্ম যন্ত্রাদি তৈরী সম্ভব নয়, অতএব শুরু হল ধাতু প্রযুক্তির বিপ্লব।

প্রমাণ পাওয়া গেছে দশ হাজার বছর আগেও মানুষ তামার ব্যবহার জানত, কিন্তু আকরিক অবস্থা থেকে তাম্রমৌল আবিষ্কার হয়েছিল আনুমানিক

সাত হাজার বছর আগে, সবুজ রঙের ম্যালাচাইটকে আগুনে পুড়িয়ে। তবে তামা নরম ধাতু, এর থেকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি তৈরী করা যেত না। তাই মানুষ শিখল তামার সঙ্গে টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জ নামে সংকর ধাতু তৈরী করতে (আঃ ৩৮০০ খ্রীঃ পূঃ)। চীনের শ্যাং বা শান বংশের রাজত্ব কালে সেখানে ব্রোঞ্জ শিল্প অভাবনীয় উৎকর্ষ লাভ করে।

লোহার ক্ষেত্রেও তাই। প্রমাণ পাওয়া গেছে হাজার ছয়েক বছর আগেও উল্কার লৌহপিণ্ড থেকে মানুষ অস্ত্রাদি তৈরী করত। ঋক্ বেদেও লৌহার তৈরী বাটির উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু আকর থেকে প্রথম লোহা তৈরী করে কৃষ্ণসাগর উপকূল বাসী হিটাইট জাতি (আঃ ১৫০০ খ্রীঃ পূঃ)। পরে লোহার সঙ্গে কার্বণ মিশিয়ে ইস্পাত আবিষ্কার হয় ভারতে (আঃ ১০০০ খ্রীঃ পূঃ)। তামা এবং লোহা ধাতু দুটি মানুষের জীবনকে এমন ভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল যে নরম তামার চিহ্ন ♀ দিয়ে নারী, এবং শক্ত লোহার প্রতীক ♂ দিয়ে পুরুষ বোঝানোর রীতি চলে আসছে সেই প্রাচীন কাল থেকে।

ক্রমশ ভারত প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতার লালনভূমিগুলিতে দেখা দিল রসায়ন চর্চা। রসায়ন অর্থাৎ "রস" শাস্ত্র ; রস অর্থে প্রাণ রস এই ছিল প্রাচীন ভারতীয় রাসায়নিকদের বিশ্বাস। তাঁরা মনে করতেন আত্মার ক্ষেত্রেও যেমন "নৈনং দহতি পাবক," অগ্নিদগ্ধ করলে শুধু মাত্র "শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী," তেমনি অগ্নি কোন কিছুই ধ্বংস করে না, রূপান্তর ঘটায় মাত্র। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে নাগার্জুন প্রমুখ ভারতীয় রাসায়নিকরা দেখালেন লাল রঙের হিঙ্গুল (Cinnabar, মারকারি সালফাইড) আগুনে পোড়ালে নষ্ট না হয়ে রূপান্তর ঘটে পারদে, যাকে আবার অগ্নি দগ্ধ করলে ফিরে পাওয়া যায় পারদ গন্ধক যৌগ মকরধ্বজ, যা রসতান্ত্রিক চিকিৎসার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পারদ ছাড়া চরক এবং শুশ্রুত সংহিতায় ওষধিরূপে সোনা, তামা, রূপা, সীসা প্রভৃতি ধাতুরও ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ভারতীয় ঋষিদের এই জীবন দর্শন সঞ্চারিত হয়েছিল ইউরোপের মধ্য যুগীয় অ্যালকেমিষ্টদের মধ্যে, তবে প্রকারান্তরে। তাঁরাও মনে করতেন জড় ও জীবন দুয়েরই মূল উপাদান মরুৎ, অপ, তেজাদি পঞ্চভূত, উপরন্তু সোনা, যার জৌলুসে অ্যালকেমিষ্টরা স্বর্ণমরীচিকায় হয়েছিলেন বিভ্রান্ত। পরে

অবশ্য তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন জীবনের ওপর পারদ, গন্ধক ইত্যাদি মৌল এবং লবণ যৌগের প্রভাব। অমৃত রসের সন্ধানে বা অন্যধাতু থেকে সোনা তৈরীর আলেয়ার পেছনে ছুটলেও, অ্যালকেমিষ্টরা ধাতু প্রযুক্তিকে অনেক এগিয়ে নিয়ে গেছলেন। কিন্তু তাঁদের প্রচেষ্টায় রসায়নাগারে যে পরিমাণ ধাতু তৈরী হত, এর বহুমুখী ব্যবহারের পক্ষে তা সামান্যই।

যতদূর প্রমাণ পাওয়া গেছে, খনি থেকে বিশুদ্ধ বা আকরিক স্বর্ণ রৌপ্য বা সীসা উৎপাদন শুরু হয় প্রাচীন গ্রীসে এবং মিশরে টলেমিদের আমলে। নুবিয়ার বিখ্যাত স্বর্ণখনি তার উদাহরণ। গ্রীক্ ঐতিহাসিক ডায়োডোরাস খ্রীঃ পূঃ অর্ধশতাব্দীতে এ জাতীয় এক স্বর্ণখনি পরিদর্শন করে সেখানকার শ্রমিকদের জীবন যাত্রার ভয়াবহ পরিস্থিতি লিপিবদ্ধ করে গেছেন এবং শ্রমিকদের দুরবস্থার সংগত কারণও ছিল, যেহেতু তৎকালে খনিতে কাজ করার জন্য কৃতদাস বা দণ্ডিত অপরাধীদেরই কেবল নিয়োগ করা হত। খনি শ্রমিকদের নিরাপত্তার কিছু হাস্যকর ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায় দ্বিতীয় শতাব্দীর রোমে। তারা থলির মধ্যে ঢুকে মুখে রবারের মুখোশ এঁটে কাজ করত।

[২]

আদিম কাল থেকেই মানুষ বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত থাকলেও পেশাকে নিরাপদ এবং স্বাস্থ্য সম্মত করতে কার্য্যকরী ভাবনা চিন্তা শুরু হয়েছে মাত্র শ'তিনেক বছর আগে, নবজাগরণের উষালগ্নে। মধ্যযুগ বা তারও আগেকার সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমিকরা ছিল ব্রাত্যজন। অর্ধাহার, অনাহারে শারীরিক আর্তির বিনিময়ে বুদ্ধিজীবী বা সামন্তরাজদের বিলাস ব্যসনের উপকরণ জোগানই ছিল তাদের একমাত্র সামাজিক কর্তব্য। খেটে খাওয়া মানুষ তৎকালীন সমাজে এমনই অপাংক্তেয় ছিল যে গ্রীক্ মহাকাব্যের হেকাইস্‌টাস্‌ বা রোমের ভালকান্ ইত্যাদি বিশ্বকর্মাদের পর্য্যন্ত কল্পনা করা হয়েছে কুৎসিৎ, বিকলাঙ্গ। সক্রেটিসের মত দার্শনিকও কায়িক শ্রমকে হেয় করে গেছেন, কারণ তারা কামারশালা বা কারখানার চার দেওয়ালের মধ্যে সমাজে অবহেলিত হয়ে আজীবন কাটিয়ে দিত। পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক হিপক্রেটিসও (আঃ ৩৭০ খ্রীঃ পূঃ) তাঁর অবদানকে সামাজিক ভাবে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন ধনিক শ্রেণীর মধ্যে, এই সব ভাগ্যহতদের বাদ দিয়ে।

তিনি বলতেন রোগের সৃষ্টি প্রাণী ও পরিবেশের অসংগতি থেকে এবং চিকিৎসকের কর্তব্য এই সংগতি ফিরিয়ে আনতে প্রকৃতিকে সাহায্য করা। তিনি এবং তাঁর উত্তরসূরীরা পরিবেশ বলতে কিন্তু সমাজের তথাকথিত উচ্চতর সম্প্রদায়ের পরিবেশই বুঝাতেন, বুকের রক্ত দিয়ে যারা এই পরিবেশ গড়ে তুলত তাদের কথা চিকিৎসা শাস্ত্রে অবহেলিত ছিল ষোড়শ শতাব্দীপর্য্যন্ত।

চিকিৎসাশাস্ত্রকে এই শ্রেণীবোধ এবং অ্যালকেমিস্টদের কুসংস্কার মুক্ত করে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেন আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রবাদ পুরুষ অরিওলাস্ থিওফ্রেসৃটাস্ বমবাসৃটাস্ ভন্ হেইন্হেম ওরফে 'প্যারাসেলসাস' (১৪৯৩-১৫৪১ খ্রীঃ)। তিনি এবং তাঁর সমসাময়িক জর্জিয়াস এগ্রিকোলা খনি বা অন্যান্য ক্ষতিকর পেশায় নিযুক্ত শ্রমিকদের আর্তি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। জোয়াচিম্সৃটাল্ খনিপ্রধান অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক থাকা কালীন এগ্রিকোলা তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে "De Re Metallica" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন (১৫৫৬ খ্রীঃ) এবং এখানে তিনি খনি শ্রমিকদের অপঘাত, ফুসফুসের ও চোখের ব্যাধি ইত্যাদির নিখুঁত না হলেও প্রণিধান যোগ্য বর্ণনা দিয়েছেন, বলেছেন কী করে খনির দূষিত বাতাস শোধন করতে হয়। এঁদের আগে খনি শ্রমিকদের স্বাস্থ্যহীনতা শয়তানের কারসাজি এবং তাতে মানুষের কিছু করার নেই বলেই ধারণা ছিল।

দিকদিশারী হলেও প্যারাসেলসাস বা এগ্রিকোলা শ্রমিকদের জন্য বিশেষ কিছু করে যেতে পারেন নি। পেশাগত ব্যাধির কারণ অনুসন্ধান, তাদের প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা নিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক ভাবনাচিন্তার পথিকৃত বলা যায় ইতালীর বার্ণাডিনো র‍্যামাজিনিকে (১৬৩৩-১৭১৪ খ্রীঃ) সামন্ততন্ত্র এবং পুঁজিবাদের যুগ সন্ধিক্ষণে জন্মগ্রহণ করেও তিনি শ্রমিক কল্যাণে সারা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। কথিত আছে, ম্যাডেনায় তাঁর বাড়িতে একবার এক শ্রমিক সেস্‌পিট্ পরিষ্কার করতে নামে। র‍্যামাজিনি লক্ষ্য করেন ব্যক্তিটি ওই নোংরা কাজ শেষ করবার জন্য অবিশ্রান্ত খেটে চলেছে। ত্বরার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে লোকটি বলেছিল নরককুণ্ড থেকে যত তাড়াতাড়ি মুক্তি পাওয়া যায় ততই ভাল। ঘটনাটি র‍্যামাজিনির মনে গভীর রেখা পাত করে। সারাজীবনের গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি "De morbis Artificum Diatriba" নামে পেশাগত ব্যাধি সম্বন্ধে এক

প্রামাণ্য গ্রন্থও রচনা করে গেছেন। এখানে তিনি অন্তত সাতাশ রকম পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তির পেশাগত ব্যাধির আলোচনা করেছেন।

তবু তাঁর সময়ে সমস্যাটা আজকের মত জটিল আকার ধারণ করেনি ; আজকের তুলনায় সে যুগে পেশার সংখ্যা ছিল সীমিত। আরও পরে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে এল বিপ্লবের জোয়ার, জনমানসে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে, শিল্পে। ওই একটি শতাব্দীতেই এমন কতগুলি ঘটনা পর পর ঘটে যায় যে ওদেশের মানুষের জীবনযাত্রা গেল আমূল বদলে, শুরু হল বহু নতুন নতুন পেশা এবং তার সঙ্গে দেখা দিল পেশাগত ব্যাধির বন্যা। যদিও এঙ্গেলস, টয়েনবি ইত্যাদি ঐতিহাসিকরা ১৭৬০-১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দকে শিল্প বিপ্লবের যুগ বলে চিহ্নিত করেছেন কিন্তু এর সূত্রপাত হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই, ইংলণ্ডে সুতিবস্ত্র শিল্পের সম্প্রসারণ দিয়ে ; বস্তুত ইংলণ্ডকেই বলা যায় শিল্পবিপ্লবের জন্মস্থান। পেশাগত ব্যাধি সম্বন্ধে তাঁর বইয়ে শিলিং বলেছেন 'From the earliest times India was the home of the cotton industry and for centuries the Hindu* skill in making textiles was the main source of his country's wealth. [বহু প্রাচীনকাল থেকেই ভারত কার্পাসশিল্পের জন্মস্থান এবং বহু শতাব্দী ধরেই হিন্দুদের বস্ত্রবয়ন কৌশল দেশীয় সম্পদের মুখ্য উৎস ছিল]।' কিন্তু শিলিং যা বলেন নি সেটা হল এই যে শুধু "his country's wealth" নয়, ইংলণ্ডের সম্পদেরও প্রধান উৎস ছিল ভারত। শিল্পবিপ্লবে কথাটা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে এর বিশদ ব্যাখ্যা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর আগেই, তৃতীয় এডোয়ার্ডের রাজত্বকাল থেকে ইংলণ্ড ছিল উল শিল্পের পীঠস্থান এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে সেখানে কিছু সিল্ক বস্ত্র তৈরীর প্রচেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু সফল হয় নি। ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সুসংবদ্ধ হয়ে ভারত থেকে ইংলণ্ডে কার্পাসবস্ত্র আমদানি শুরু করে এবং যেমনটি বহু বহু শতাব্দী চলে এসেছে, ঢাকাই মসলিন ইত্যাদি ভারতের কুটির শিল্পজাত বস্ত্র ইংলণ্ডবাসীরও মন হরণ করে। ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যের এই অভাবনীয় জনপ্রিয়তা কিন্তু অনেক গোঁড়া ইংরাজ শিল্পপতির পছন্দ হল না। তাঁদের চাপে পড়ে পার্লামেণ্ট শিল্পজাত দ্রব্যের

* ভারতবাসীকে হিন্দু নামে অভিহিত করাটা ইংরেজি ভাষায় বহুল প্রচলিত বিভ্রম।

বদলে ভারত থেকে কাঁচামাল অর্থাৎ তুলা আমদানির আইন পাশ করলেন অচিরেই।

এর পর প্রযুক্তিবিদ্‌দের কয়েকটি যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে ইংলণ্ড স্থতি বস্ত্র তৈরী করে রাতারাতি পৃথিবীর বাজার অধিকার করে নিল। আবিষ্কারগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল কে সাহেবের মাকু, হারগ্রিভসের চরখা, আর্করাইটের স্থতো বোনার কল, কার্টরাইটের কলের তাঁত এবং ক্রমপটন সাহেবের স্থতাকাটার কল। একটা শিল্প যখন গড়ে ওঠে তার সঙ্গে আরও অনেক আনুষঙ্গিক শিল্প সৃষ্টি হয়। প্রয়োজনের তাগিদে মাল চলাচলের জন্য ইংলণ্ডেও ওই সময় গড়ে উঠেছিল আরও অনেক শিল্প; তৈরী হল খাল, পাকা রাস্তা; টেলফোর্ড, ম্যাকাডাম প্রভৃতি প্রযুক্তিবিদরা রাস্তা পাকা বাঁধাইয়ের পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। তবু বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হওয়াতে বস্ত্র শিল্পের যে স্থবিধা হয়েছিল এমনটি বোধ হয় আর কোন কিছুতে হয় নি এবং বাষ্পের চাহিদা মেটাতে কয়লা খনিগুলিতেও উৎপাদন বাড়াবার প্রয়োজন দেখা দিল। গড়ে উঠল ম্যানচেষ্টার, লিভারপুল, বার্মিহাম প্রভৃতি শিল্পোন্নত শহরগুলি, আর তাদের আকাশ ভেদকরা কলের চিমনি জনস্বাস্থ্য বিধ্বস্ত করে ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে ঘোষণা করতে শুরু করল শিল্পপতিদের জয়বার্তা।

স্থতিবস্ত্র শিল্পে বিপ্লবের সঙ্গে রাসায়নিক শিল্পেও বিপ্লব দেখা দিল এই শতাব্দীতেই। নবজাগরণের "Sapre Aude" অর্থাৎ যুক্তি ও বিবেচনা দিয়ে সব কিছু যাচাই করে নেওয়ার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে সপ্তদশ শতাব্দীতেই রবার্ট বয়েল প্রমুখ বিজ্ঞানীরা রসায়ন সম্বন্ধে অ্যালকেমিষ্টদের অন্ধবিশ্বাসগুলিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে আরম্ভ করেছিলেন। পৃথিবী চারটি মাত্র মৌল পদার্থ দিয়ে তৈরী বলে মধ্যযুগীয় যে ধারণা চলে আসছিল, তাকে নস্যাৎ করে বয়েল জানালেন মৌল পদার্থ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য। অপবিজ্ঞানের অন্ধকারে দেখা দিল বিজ্ঞানের আলো, যে আলো অষ্টাদশ শতাব্দীতে রসায়নের গভীরে পথ দেখাল প্রিসলে, বুত্তরহাভ, ল্যাভয়সিয়ে প্রমুখ দিকপালদের। শুরু হল মানুষের প্রয়োজনে রসায়নের প্রয়োগ। ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে জন রোবাক্ আবিষ্কার করলেন লেডচেম্বার পদ্ধতিতে সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরীর প্রণালী, ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে নিকোলাস লাব্লাঙ্ক সোডা তৈরীর উপায় এবং বারটোলেট

ব্লিচিং পাউডার। রসায়নাগারে শীলারের তৈরী সবুজ, ক্রোম রঙ বা বেয়ারের তৈরী নীল, জৈব রঙের স্থলাভিষিক্ত হল।

[৩]

এ যুগের আর এক অবদান চাষ পদ্ধতির প্রভূত উন্নতি, যার ফলে চাষ আবাদও শিল্পের পর্যায়ে (agro industry) পৌঁছে গেল। এ ব্যাপারে পুরোধা ছিলেন জেথরো টুল নামে এক আইনের ছাত্র, যিনি মাত্র পঁচিশ বছর বয়সেই চাষ আবাদকে জীবনের প্রধান উপজীবিকা করে নেন। হলকর্ষণের উপকারিতা মানুষ বহু শতাব্দী আগে থেকেই জানত, রামায়ন মহাভারতেও এর ব্যাপক উল্লেখ আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই টুল্ বীজ বপনের ড্রিল আবিষ্কার করে চাষে যন্ত্রযুগের সূচনা করলেন। কিন্তু ভদ্রলোক একাধারে যেমন মেক্যানাইজড্ (mechanized) ফারমিং বা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষ আবাদের সূত্রপাত করেন অন্যদিকে তেমনি চাষের অগ্রগতিকে ব্যাহতও করেছিলেন, কারণ তিনি প্রচার করতেন সার দিলে জমির ক্ষতি হয় এবং চাষের জন্য জমি পরিবর্তন (rotation crop) এর দরকার নেই। পরে অবশ্য কোক্, লাভেল প্রমুখ ভূস্বামীরা ভাগচাষ, রবিশস্যের প্রচলন, দোঁয়াশ মাটির ব্যবহার ইত্যাদির দ্বারা চাষ পদ্ধতির আধুনিকীকরণ করলেন এবং যথাকালে চাষের সঙ্গে পশুপালন প্রথারও উন্নতি হল।

আরও দেখা গেল এই শতাব্দীতেই একদিকে যেমন চলছিল যন্ত্র যুগের উন্নতি অন্যদিকে জনজীবনে ঘটছিল নানা পরিবর্তন। কাঁচা টাকার মোহে এবং ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট "এনক্লোজার আইন" পাশ করার ফলে খেত খামার ছেড়ে লোকজন দলে দলে শিল্পাঞ্চলগুলিতে চাকরি নিতে শুরু করল। ফলে শহরের জনসংখ্যা বেড়ে গেল হু হু করে, দেখাদিল জনস্বাস্থ্য এবং বিশেষ করে শ্রমিক স্বাস্থ্য সমস্যা—আবাসন এবং কলকারখানার দূষিত পরিবেশের জন্য। কিন্তু রবার্ট ওয়েন বা মাইকেল স্যাডলার এর মত কয়েকজন ব্যতিক্রম ছাড়া পুঁজিপতিরা তখন পুঁজির নেশায় মশগুল, এ্যাডাম স্মিথ 'ফ্রি ট্রেড্ নীতি' প্রচলনে ব্যস্ত, শ্রমিক বা ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত সমাজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ভাবনা চিন্তা করে কে? ফলে পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটতে শুরু করল। শিল্প বিপ্লবের প্রত্যক্ষ অবদান স্বরূপ ইংলণ্ডের শহর এবং শহরবাসীর যে কীমর্মন্তুদ অবস্থা হয়েছিল তার কিছু নমুনা পাওয়া যায় ডিকেন্সের "হার্ড টাইমস্" বা

"অলিভার টুইসট্" ইত্যাদি উপন্যাসে। শিল্পের প্রাণ-পদার্থ কয়লার দৌলতে শহরের বাতাস প্রাণঘাতী ধোঁয়াশাতে এবং রাস্তা ঘাট পর্বত প্রমাণ নোংরা আবর্জনায় ভর্ত্তি হয়ে উঠেছিল। বসতির মধ্যেও অনুপ্রবেশ করত খোলা ড্রেনের মলমূত্রের পূতিগন্ধ আর ধোঁয়া। এর ওপর ছিল মান্ধাতার আমলের পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা। এমতাবস্থায় ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে শিল্পোন্নত শহরগুলিতে কলেরা যে মহামারী রূপে দেখা দিয়েছিল এতে আর আশ্চর্য্য কী?

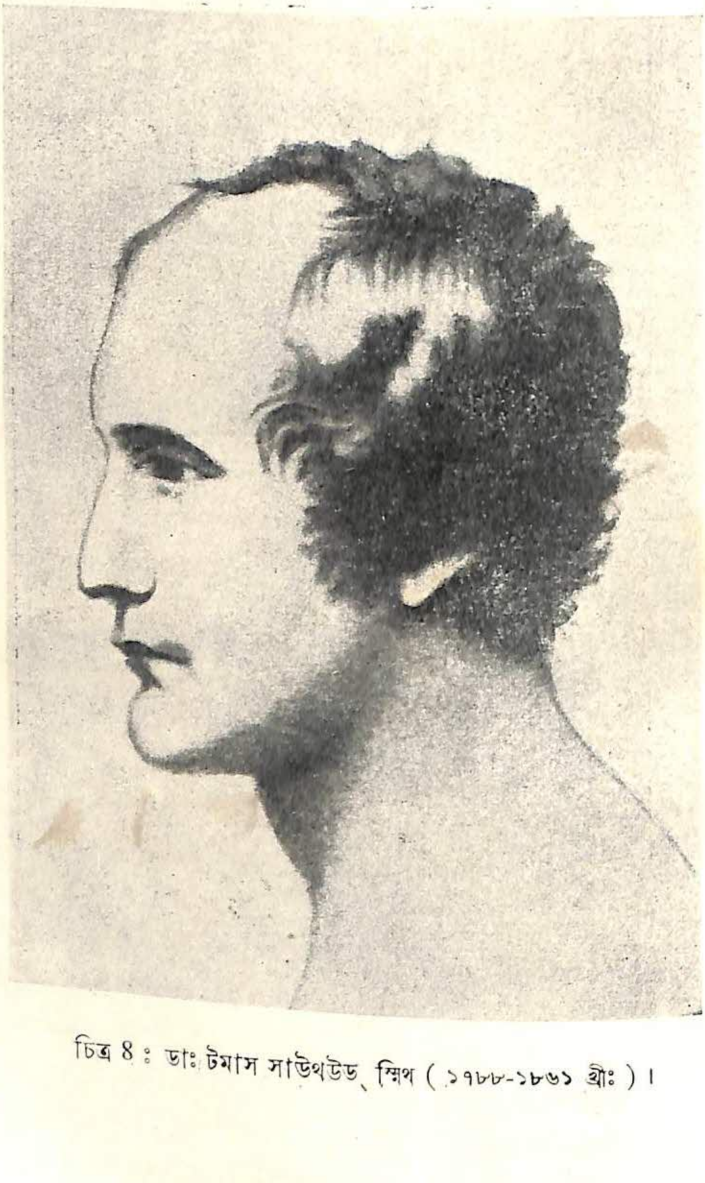
তবু হোমো সেপিয়ন্স সভ্যতার উৎকর্ষতা এমনই যে উনবিংশ শতাব্দীতেই জনস্বাস্থ্য এবং পেশাগত ব্যাধি নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়েছিল এবং যেহেতু শিল্প বিপ্লবের দৌলতে ইংলণ্ডেই সমস্যাটি তীব্রতম হয়ে দেখা দেয় তাই সমাধান নিয়েও ভাবনা চিন্তার সূত্রপাত ওই মাটিতেই। মজার কথা এই যে পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত ভয়ের মানসিকতা থেকেই ইংলণ্ডে শ্রমিক স্বাস্থ্য সমন্ধে গণআন্দোলনের সূত্রপাত। ল্যাঙ্কাশায়ারের অন্তর্গত র‍্যাটক্লিফ শহরে একবার টাইফাস রোগ মহামারী রূপে দেখা দেয়। ওই শিল্পাঞ্চলের পুঁজি-পতিরা (যাদের মধ্যে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার রবার্ট পীল অন্যতম) ভীত হয়ে ডাঃ টমাস পার্সিভালকে মহামারীর কারণ অনুসন্ধানে নিযুক্ত করেন এবং তাঁর প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ফ্যাক্টরী আইন পাশ হয়, যার ফলে শ্রমিকদের কাজের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হল ১২ ঘণ্টা; তাদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করা এবং কর্মস্থল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং আলোবাতাসময় রাখার নির্দেশও ছিল ওই আইনে।

ইংলণ্ডের মাটিতে পেশাগত ব্যাধি নিয়ে পুনর্ভাবনা শুরু করেন ডাঃ চার্লস টার্ণার থ্যাকরা এবং তিনি এ বিষয়ে "The effects of principal arts, trades and professions and of civic states and habits of living on health and longevity" নামে একটি তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করেন যার ওপর ভিত্তি করে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে স্যাডলার আইন পাশ হয়। কিন্তু জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে গণবিক্ষোভ তীব্রতর হল ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে স্যার এডউইন চ্যাডউইকের নেতৃত্বে। পুওর ল কমিশনের সচিব হিসাবে চার বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি যে প্রতিবেদন তৈরী করেছিলেন তাতে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি প্রকাশ পায়। তাঁর রিপোর্টের এক জায়গায় তিনি বলেন "Whilst the houses,

streets, courts, lanes and streams are rendered pestilential, the civic officers have generally contended themselves with most barberous expedient or sit still among the polution with the resignation of Turkish fatalist under the supposed destiny of prevalent ignorance, sloth and filth.” (ঘরদোর, অঙ্গন প্রাঙ্গন, পথ ঘাটের পরিবেশ যখন চূড়ান্তভাবে দূষিত হচ্ছে, পুরপ্রধানরা তখন তুর্কী অদৃষ্টবাদীদের মত সবকিছু সমকালীন অজ্ঞতা এবং আবর্জনার ওপর ছেড়ে দিয়ে নাকে সর্ষের তেল দিয়ে এই দূষিত পরিবেশে ঘুমাচ্ছেন) অবশ্য এই তীব্র কসাঘাতেও পুঁজিপতি অধ্যুষিত পার্লামেন্টের চেতনা হয় নি; তবে তাঁরই অনুপ্রেরণায় উইলিয়াম ফার ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে “রেজিসট্রার জেনারালস অকুপেশনাল্ মরটালিটি সাপ্লিমেণ্ট” প্রকাশ করেন এবং ডাঃ সাউথউড স্মিথ, ডঃ জেমস কে, ডাঃ জর্জ সাইমন প্রমুখ চিকিৎসকরা পেশাগত ব্যাধি নিরোধ আন্দোলনের সামিল হল। ক্রমশ পার্লামেণ্ট গণমতের কাছে নতি স্বীকার করলেন; ১৮৪৭ খ্রীঃ দুটি গুরুত্বপূর্ণ আইন পাশ হলঃ (১) Towns improvement clauses act” এবং (২) ওই সালের ফ্যাক্টরী অ্যাক্টে শ্রমিকদের কাজের সময় কমিয়ে দৈনিক দশ ঘণ্টা এবং বালক ও নারী শ্রমিকের ক্ষেত্রে সপ্তাহে মোট ৫৮ ঘণ্টা করা হল। পরের বছরই আবার City sewers act পাশ হয়, ফলে শহর এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতিও দেখা দিল। এরপর থেকে সাধারণভাবে জনস্বাস্থ্য, বিশেষ করে শ্রমিক স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে পর পর আরও কতগুলি ব্যবস্থা নেওয়া হয়; যথা ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে বালকশ্রমিক নিয়োগ সম্বন্ধে কমিশন, ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের **Factories and Workshops Act** দ্বারা পেশাগত ব্যাধি নিরোধকল্পে কতগুলি ব্যবস্থা গ্রহণের কথা এবং পেশাবিশেষে বালক এবং নারী শ্রমিক নিয়োগ না করার কথা বলা হয়, ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড সাফটসবেরীর প্রচেষ্টায় শিল্পে বালক নিয়োগের প্রথা আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে Factories (Lead poisoning) Act এবং ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ জন সাইমনের নেতৃত্বে Public Health Act পাশ হয়।



চিত্র 7 : বার্ণাডিনো র‍্যামাজিনি (১৬৩৩-১৭১৪ খ্রীঃ)।



চিত্র ৪ : ডাঃ টমাস সাউথউড্ স্মিথ (১৭৮৮-১৮৬১ খ্রীঃ) ।

২নং তালিকা ঃ অষ্টাদশ শতকে যে সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পবিপ্লব, তথা পেশাগত ব্যাধির প্রকোপ দেখা দিয়েছিল।

সাল	ঘটনা বা আবিষ্কার	আবিষ্কারকের নাম
১৭০১	শস্যবপনের যন্ত্র (Drill)	জেথরো টুল (Jethro Tull)
১৭০৮	চীনামাটি	বটগার(Johann Bottger)
১৭০৯	কয়লার সাহায্যে আকরিক লোহা থেকে লোহা উৎপাদন	ডার্বি (Abraham Darby)
১৭১২	বাষ্পচালিত পাম্প	নিউকোমেন (Thomas Newcomen)
১৭২১-৪২	'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী' নীতির প্রবক্তা	ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ওয়াল-পোল (Walpole)
১৭৩২	শস্য মাড়াই কল	মেন্‌জিস (Michael Menzies)
১৭৩৩	মাকু	জন কে (John Kay)
১৭৪৭	বিট থেকে চিনি উৎপাদন	মারগ্রাফ (Andreas Marggraf)
১৭৫০	পার্লামেণ্ট "Enclosure" আইন পাশের ফলে বহু লোক গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে কল কারখানায় কাজ নিতে বাধ্য হল	—
১৭৬০	ইতিহাসের ছাত্রদের সুবিধার জন্য বছরটিকে শিল্পবিপ্লবের সূচনা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়	—
১৭৬৪	Spinning Jenny বা সুতা কাটার কল	জেম্‌স্ হারগ্রীভ্‌স্ (James Hargreaves)

সাল	ঘটনা বা আবিষ্কার	আবিষ্কারকের নাম
১৭৬৯	বাষ্পচালিত ইঞ্জিন	জেম্‌স্ ওয়াট (James Watt)
১৭৭৬	'ফ্রী ট্রেড' নীতি	অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith)
১৭৭৭	শস্য ঝাড়াই কল	জেম্‌স্ শার্প (James Sharp)
১৭৮৫	ব্লিচিং পাউডার	বারথোলেট (C. L. Berthollet)
১৭৮৭	যান্ত্রিক তাঁত	কার্টরাইট (Edmund Cartwright)
১৭৯৩	Board of Agriculture-এর পত্তন	—
১৮০০	লেদ্ মেশিন	মডস্লে (Henry Maudslay)

এর ওপর উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এমন এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেল যার কাছে শ্রমিক স্বার্থে এই সব আন্দোলনও তুচ্ছ মনে হয়। ঘটনাটি হল মার্কসের নেতৃত্বে বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজতন্ত্রের অভ্যুত্থান। যদিও অষ্টাদশ শতাব্দীতেই রুশো, ভলতেয়ায়, কাণ্ট প্রমুখ দার্শনিকেরা বা উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ওয়েন, সাফ্‌ট্‌সবেরী প্রমুখরা এর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, মার্কসই প্রথম তাঁর তত্ত্বে সমাজতন্ত্রকে অর্থনীতির বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠা করেন। মার্কসবাদই সর্বপ্রথম এই সত্য প্রতিষ্ঠা করল যে পুঁজি ও মুনাফা ভিত্তিক সমাজে শ্রমজীবীদের শ্রমশক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য নিম্নতম যতটুকু মজুরী দিলে এবং যতটুকু স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তাঁরা সর্বোচ্চ মুনাফার উপযোগী উৎপাদনে সক্ষম হন, ঠিক ততটুকু সুযোগ সুবিধা তাঁদের দেওয়া হয়; তাও সেই সামান্যতম সুবিধাটুকুও আদায় করতে হয় তীব্র এবং কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। তারই জন্য বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতি সত্ত্বেও শ্রমজীবীদের স্বার্থে আধুনিক আবিষ্কারগুলিকে যথাযথ কাজে লাগান হয় না, জনস্বাস্থ্য রক্ষায় কিম্বা পেশাগত ব্যাধি প্রতিরোধে আইন পাশ হলেও সে আইনের

পূর্ণ মর্য্যাদা দেওয়া হয় না। পুঁজিবাদী সমাজে এই তিক্ত অভিজ্ঞতা প্রায় সর্বত্র।

আশ্চর্য্য এবং আফসোসের কথা, যদিও মনুষ্য সভ্যতার ইতিহাসে ভারতের অবদান অনস্বীকার্য্য তবু মাত্র শ'খানেক বছর আগেও এখানে পেশা বলতে বোঝাত প্রধানত কৃষিকার্য্য ও পশুপালন এবং কিছু কুটির শিল্প। এদেশে ভারী শিল্পের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত, তাও শুরু হয়েছে ইংরাজদের আমলে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে শিল্প তথা জীবনযাত্রা এবং পেশায় যে আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল তার উৎস ছিল ভারতসহ অন্যান্য উপনিবেশ-এ কথা আগেই বলা হয়েছে। তবু ভারতীয় শিল্পে সে জাতীয় কোন অগ্রগতি হয় নি, বরঞ্চ বাঙলার বস্ত্রশিল্প বা বাঙলা-বোম্বাই এর জাহাজ শিল্প ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারেনি, মার খেয়েছে। ইংলণ্ডে প্রযুক্তি বিদ্যার অগ্রগতিকেই এর একমাত্র কারণ মনে করা ভুল হবে; ইংরাজরা আমাদের বস্ত্রশিল্প ধ্বংস করার জন্য তাঁতিদের আঙুল কেটে দিত বা ভাতে মারার জন্য জোর করে নীল চাষ করাত ইত্যাদি কিংবদন্তীগুলি সত্য হলেও সামগ্রিক ইতিহাসে ঘটনাগুলির বেশী মূল্য নেই। বরঞ্চ দেখা যায় কোম্পানী শুরুতে তুলা, সিল্ক বা পাট উৎপাদনে নতুন প্রাণ সঞ্চারেরই চেষ্টা করেছিল, যদিও নিজ স্বার্থে। বলা বাহুল্য এই সব পণ্য ভবিষ্যতে ভারতের অর্থনীতিতে গভীর প্রভাবও বিস্তার করেছিল। ভারতীয় শিল্পের স্থাবরত্বের আসল কারণ অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং রক্ষণশীল জীবনযাত্রার মোহে শিল্প প্রচেষ্টায় অনীহা। ডি. আর. গ্যাড্‌গিলের উক্তিতে "They felt the foreign rule, they felt the heavy assessments, they felt the decay of institutions, but they did not feel the competition of foreign goods or other external forces effectively enough to induce them to change their industrial methods or organizations." [তারা (ভারতবাসীরা) বিদেশীর শাসন অনুভব করত, শোষণ অনুভব করত, সনাতন প্রথার অবক্ষয় হচ্ছে তাও বুঝতে পেরেছিল, যা বোঝেনি সেটা হচ্ছে বিদেশী শিল্প দ্রব্যের প্রতিযোগিতা বা ওই জাতীয় শক্তিগুলির গুরুত্ব, যার ফলে তারা শিল্পের প্রাচীন প্রথা বা সংগঠন পরিবর্তনে উদ্যোগী হয় নি।]

যাই হোক, উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ভারতের তথা ইংলণ্ডের ইতিহাসে এমন দুটি ঘটনা ঘটল যার ফলে ভারতীয় শিল্পের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছিল। প্রথমত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিলুপ্তির ফলে ভারত ইংরাজ বেনিয়ার রাহুমুক্ত হল এবং দ্বিতীয়ত আমেরিকার গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়াতে ভারতীয় তুলার চাহিদা বেড়ে গেল; চাষীরাও তুলা উৎপাদনে উৎসাহিত হল। ক্রমশ কাঁচামাল চলাচলের প্রয়োজনে উপযুক্ত রাস্তাঘাট দরকার বলে তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহাউসি পাবলিক ওয়ার্কস ডিপারট-মেনট্ (p. w. d.) তৈরী করলেন (১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ)। ১৮৪৯ সালে কলকাতার উপকণ্ঠে এবং ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই থেকে থানা পর্যন্ত পরীক্ষামূলক ভাবে রেলগাড়ী চালান হলেও ডালহাউসিই প্রথম রেলপথের বিস্তারের দিকে নজর দেন এবং ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতের মাটিতে মোট পাঁচ হাজার পনের মাইল রেল লাইন পাতা হয়।

এদিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদেই ভারতের পৃথিবীখ্যাত হস্ত তথা কুটির শিল্পের অবক্ষয় শুরু হয়, যার প্রধান কারণ রাজকীয় আড়ম্বরের ক্রমাবলুপ্তি, সাম্রাজ্যবাদী প্রতিকূলতায় রপ্তানী বাণিজ্যের সঙ্কোচন, বিদেশী সংস্কৃতির প্রভাবে এই সব শিল্পদ্রব্যের প্রতি দেশবাসীর অনীহা এবং বিদেশী পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের আগে ভারতে কলকারখানা বলতেও নীল কারখানা ছাড়া আর কিছু ছিল না। ১৮৫১ সালে বোম্বাইয়ে প্রথম কাপড়ের কল স্থাপিত হয় (Bombay spinning and weaving Company); তারপর ওই অঞ্চলে দু' একটি করে কাপড় তৈরী বা তুলা গাঁট বাঁধাই কল তৈরী হতে শুরু করল। পাটের ব্যাপারে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এটি কুটির শিল্প পর্যায়েই ছিল; ১৮৫৪ সালে শ্রীরামপুরে প্রথম জুটমিল চালু হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ভারতের কুড়িটি জুটমিলে প্রায় বিশ হাজার শ্রমিক কাজ করত। ভারতে খনি শিল্পের সূত্রপাত ১৮২০ খৃষ্টাব্দে, রানিগঞ্জের কয়লা খনি দিয়ে; তার পর শম্বুকগতিতে এর প্রসার। এছাড়া ভারতে কারখানা বলতে আর ছিল ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাসে চার্লস ডি-সুজা প্রতিষ্ঠিত চামড়া ট্যানিং-এর কারখানা। এক কথায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ভারি শিল্প বলতে ভারতে বিশেষ কিছুই ছিল না।

অন্যদিকে চাষ আবাদ বা পশু পালনেরও কোন উন্নতি হয় নি, তার

প্রধান কারণ মুষ্টিমেয় ভূস্বামী দ্বারা কৃষক কুলের তীব্র শোষণ, চাষীদের অজ্ঞতা এবং কুসংস্কার, মান্ধাতা আমলের সেচ ব্যবস্থা ও সারের অপ্রতুলতা। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের" নামে ভূমি সংস্কারও যা হয়েছিল তা ছিল কৃষক স্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। চাষীরা চিরকালের মত হারিয়েছিল ভূমির স্বত্ব।

এই সব কারণে ভারতের মাটিতে কখনই ইংলণ্ডের মত শ্রমজাত বা পেশাগত ব্যাধির সমস্যা তীব্র আকারে দেখা দেয় নি। পৃথিবীর কাছে আজও আমরা শিল্পে অনগ্রসর জাতি বলেই পরিচিত। এমনকি চাষ আবাদ বা পশুপালনেও আমরা পেছিয়ে আছি। স্বতই পেশাগত ব্যাধি বা তার প্রতিকারের যেটুকু ভাবনা চিন্তা, তা আমরা পেয়েছি ইংরাজদের কাছ থেকে; তার প্রধান কারণ আমাদের উচ্চশিক্ষার বাহনই হ'ল ইংরাজি। আজকাল অবশ্য ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল্ অফ্ মেডিকাল রিসার্চ (I. C. M. R) এর তত্বাবধানে আমেদাবাদে কেন্দ্রীয় পেশাগত স্বাস্থ্যকেন্দ্র (COHC) বা লক্ষ্ণৌএ ইনডাসস্ট্রিয়াল টক্সিকোলজি রিসার্চ সেণ্টার ইত্যাদি সংস্থা পেশাগত ব্যাধি নিয়ে জোর কদমে গবেষণা শুরু করেছেন। তবু এই বিংশ শতাব্দীর শেষপাদেও কলকাতার মত তথাকথিত শিল্পোন্নত শহরের অবস্থার সঙ্গে চ্যাডউইক বর্নিত উনবিংশ শতাব্দীর ম্যানচেস্টার, বার্মিংহামের কি মিল খুঁজে পাওয়া যায় না?

ভৌত পরিবেশের জন্য পেশাগত ব্যাধি

(ক) তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গ সংক্রান্ত ব্যাধি

ভারত তথা পৃথিবীবাসী বহুকাল ধরেই জবাকুসুম সঙ্কাশ সূর্য্যের বন্দনা করে আসছে, কারণ ইনিই আমাদের শক্তি ও আলোর উৎস। বর্তমানে ভৌত বিজ্ঞানও আমাদের অনুরূপ ধারনা দিয়েছে, আজ আমরা জানি আলো একটি শক্তি বিশেষ। সূর্য্য থেকে যে তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গগুলি (Electro magnetic waves) পৃথিবীতে এসে পৌছয় তাদের দৈর্ঘ্যের তারতম্যেই আমরা রামধনু রঙের দৃশ্যমান সপ্তালোক উপলব্ধি করি এবং সূর্য্যরশ্মির সমস্ত বর্ণালীর মধ্যে দৃশ্যালোকই মানুষের কাজে লাগে সর্বাধিক। এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (wave length) সীমা 400-750 ন্যানোমিটার (সংক্ষেপে nm, 1 nm= 10^{-9} মিটার) অথবা 4000-7500 অ্যাংস্ট্রম্ একক। চারশত ন্যানো-মিটারের কম হলে একদিকে আমরা যেমন পর্য্যায়ক্রমে অতি বেগুনী, রঞ্জেন, গামা এবং মহাজাগতিক রশ্মি পাই অন্যদিকে সাতশ' পঞ্চাশের বেশী হলে অবলোহিত এবং বিভিন্ন রেডিও তরঙ্গ পেয়ে থাকি। এর মধ্যে আবার দৃশ্যালোক, অতিবেগুনী এবং অবলোহিত রশ্মিগুলিকে অনায়নিক বা non-ionizing এবং গামা ও রঞ্জেন রশ্মিকে আয়নিক বা ionizing বিচ্ছুরণ বলা হয় কারণ, এগুলির প্রভাবে মৌলের পরমানু থেকে আয়ন তৈরী হতে পারে।

আজকের দিনে এই সব রশ্মির উৎস আর কেবলমাত্র সূর্য্য বা মহা-জাগতিক রশ্মি নয়, কৃত্রিম উপায়েও এগুলি তৈরী করা যায় এবং শিল্পে বা চিকিৎসা বিজ্ঞানে এদের ব্যাপক ব্যবহারও হচ্ছে। ক্ষতিকারক ভৌত পরিবেশ বলতে প্রধানত এই সব তরঙ্গ বোঝায়।

(1) **দৃশ্যালোকের প্রভাবে পেশাগত ব্যাধি**—অতীতে খনি শ্রমিকদের মধ্যে একটা অসুখ প্রায়ই দেখা যেত যার নাম "মাইনারস্ নিসটেগমাস্" অর্থাৎ দৃষ্টি স্থির রাখার অক্ষমতা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালীন ইংলণ্ডের কোয়া-লিশন মন্ত্রীসভার সদস্য এনুরিন বেভান ১৩ বছর বয়সে খনিতে শ্রমিকের কাজ শুরু করেন এবং কালক্রমে এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। একই

কারণে ডার্করুম কর্মী ইত্যাদি যাঁদের অন্ধকার ঘরে কাজ করতে হয় এমন বহু পেশাতেই রোগটি দেখা দিতে পারে। অপরদিকে আবার অত্যুজ্জ্বল আলোকে যাঁরা কাজ করেন তাঁদেরও সামান্য মাথাধরা থেকে শুরু করে বহু জটিলতর ব্যাধি হতে পারে। যে সব ড্রাইভার রাত্রে দূরদূরান্তে গাড়ি চালান, বিশেষ করে যাঁদের বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চালাতে হয়, বিপরীত দিক থেকে অগ্রসর গাড়ীর চোখ ধাঁধান হেডলাইটের আলোয় তাঁদের কী পরিমাণ অসুবিধা হয়, ভুক্তভোগী মাত্রেই তা জানেন। অন্যান্য দেশে এ নিয়ে বহু ভাবনা চিন্তা হয়েছে বা হচ্ছে।

কর্মক্ষেত্রে উপযুক্ত আলোর বন্দোবস্ত থাকাটা একান্ত বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত আলো বলতে বোঝায় পেশার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কর্মকেন্দ্রের আলোকের পরিমাণ এবং সেই পরিমাণটি নির্ভর করে আলোক-উৎস, কর্মকেন্দ্রের পারিপার্শিক অথবা কর্মস্থল এবং সর্বোপরি শ্রমিকের দৃষ্টিশক্তির ওপর। উৎসের মধ্যে বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ হল (ক) উৎস কৃত্রিম না প্রাকৃতিক, (খ) আলোর ঔজ্জ্বল্য কত (গ) আলোর রঙ (ঘ) উৎসটি স্থির না চলমান (ঙ) কর্মকেন্দ্র থেকে উৎসের দূরত্ব কত ইত্যাদি। এ গুলির ওপরেই নির্ভর করে শ্রমিকের কর্মের স্বাচ্ছন্দ্য। আন্দাজে ঢিল না ছুঁড়ে উপরিউক্ত প্রত্যেকটি বিষয় আজকাল পুংখানুপুংখ পরিমাপ করে ব্যবহার করা. হচ্ছে এবং ব্যক্তি বিশেষের সুবিধামত না হলেও আলোকের উৎস এবং পরিবেশের ঔজ্জ্বল্যের একটা গড় বিপদমুক্ত সীমা কর্মস্থলগুলির জন্য সুপারিশ করা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ দেখা গেছে, সাধারণ কাজের জন্য 250 Lux (1 Lux = 1 বর্গমিটার স্থানে 1 লুমেন আলোর প্রতিফলন) উজ্জ্বলতা কর্মকেন্দ্র থেকে কর্মীর চোখে প্রতিফলিত হলেই যথেষ্ট এবং কর্মকেন্দ্রের আলোর পরিমাণ পারিপার্শ্বিক আলোর পরিমাণের বর্গের বেশী না হলে স্বচ্ছন্দে কাজ করা যায়। স্থপতিরাও আজকাল কর্মস্থল পরিকল্পনার সময় এ ব্যাপারটা খেয়াল রাখেন ; পরিবেশের আলোক প্রতি-ফলন ক্ষমতা তাঁরা মুনসেল রঙ প্রণালী (Munshell colour Method) দিয়ে বিচার করে নিচ্ছেন।

চোখ ঝলসান আলোর ব্যাপারে পরীক্ষা করে দেখা গেছে একজন সাধারন মানুষের চোখ 10^{-6} cd/m^2 থেকে শুরু করে 10^5cd/m^2 পর্য্যন্ত

উজ্জ্বলতা ভালভাবে সহ্য করতে পারে। $10^5 cd/m^2$ এর বেশী, অর্থাৎ সাধারণ দিবালোকের চেয়ে তীব্রতর আলোয় চোখ ঝলসে যায়। এর ওপর যদি আলোক রশ্মি ইতস্তত বিচ্ছুরিত হয় (যেমন বৃষ্টি ভেজা উইণ্ড স্ক্রিনের মধ্যে দিয়ে যে আলো আসে) বা উৎসটি যদি অস্থির হয় তাহলে তো কথাই নেই। চোখ ঝলসান আলোর প্রতিকার করতে শেড, খড়খড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করা দরকার।

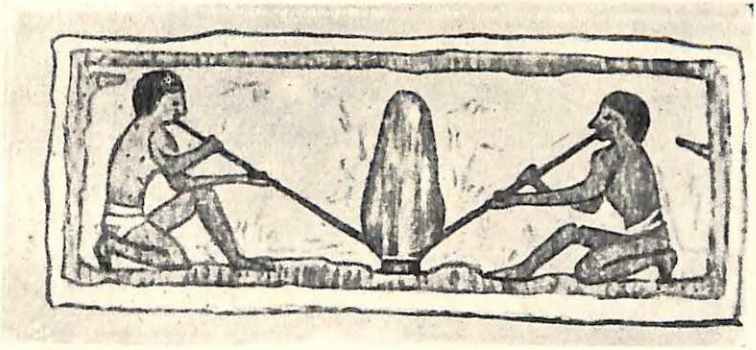
শ্রমিক বিশেষের দৃষ্টি শক্তির ব্যাপারে এটুকু বললেই প্রাসঙ্গিক হবে যে দৃষ্টিশক্তি বলতে দূর বা কাছের বস্তু যথাযথ দেখতে পাওয়ার ক্ষমতা, বিভিন্ন রঙ চেনার ক্ষমতা এবং স্বল্পালোকে অভিযোজনের ক্ষমতা বোঝায়। সাধারণত প্রায়অন্ধকারে মিনিট কুড়ির মধ্যে অভিযোজিত হওয়া চাই। কর্মে নিয়োগের সময়েই এগুলি পরীক্ষা করে নেওয়া ভাল।

(2) **পেশায় লেসাররশ্মি ব্যবহারে কুফল**—আজকাল লেসার (লাইট অ্যামপ্লিফিকেশন বাই স্টিমুলেটেড এমিসন অফ্ রেডিয়েশন) নামে এক বিশেষ ধরণের কৃত্রিম আলোক রশ্মি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং চিকিৎসা ও অন্যান্য কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। খুব সামান্য বেধের মধ্যে অবস্থান করে বহুদূর পর্য্যন্ত সমস্ত শক্তি নিয়ে লেসার রশ্মিগুলি সমান্তরাল সরলরেখায় চলে। সবকটি রশ্মিরই তরঙ্গদৈর্ঘ্য একই এবং এরা স্পন্দনরত অবস্থায় (pulses) চলতে থাকে। এই সব কারণে আলোর তীব্রতা বেড়ে যায় এবং প্রায়ই 10^8 ওয়াটের উর্দ্ধে আলোক শক্তি উৎপন্ন হয়। শক্তির এই ঘনত্বের (density) জন্যই লেসার শরীরের প্রভূত ক্ষতি করে। শতকরা একভাগও যদি কোন অন্ধকার তল থেকে প্রতিফলিত হয় তবে তা চোখ ও চামড়ার পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়াতে পারে। ACGIH সংস্থা 694·3 ন্যানোমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট স্পন্দিত লেসার এবং 400-750 ন্যানোমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ক্রমিক লেসারের দ্বারা ক্ষতি প্রতিরোধের জন্য নিরাপদ তীব্রতা সীমা বেঁধে দিয়েছেন। তা ছাড়া উপযুক্ত আচ্ছাদন দিয়ে লেসারের উৎস ও কর্মরত শ্রমিকের চামড়া, চোখ ইত্যাদি শরীরের অংশগুলি ঢেকে রাখার সুপারিশ করেছেন।

(3) **অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে পেশাগত ব্যাধি**—তড়িৎচুম্বক তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অনুযায়ী দৃশ্যালোকের ঠিক নিচেই অতিবেগুনী রশ্মির (Ultra Violet



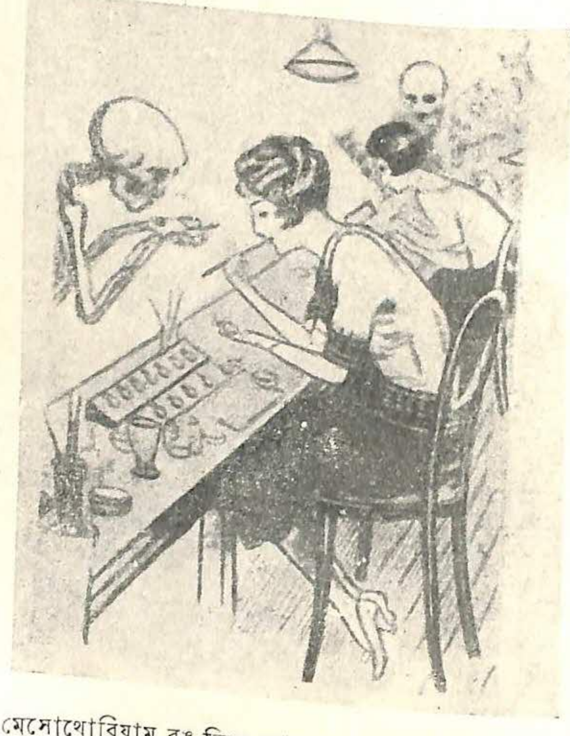
চিত্র 9 : আজকাল কর্মস্থল আলোকিত করার বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে।



চিত্র 10 : কাচ তৈরী একটি বহু প্রাচীন পেশা। ছবিতে থিবিসের কাচশিল্পী দেখা যাচ্ছে।



চিত্র 11 ঃ এক চাষীর নিম্নোষ্ঠে ক্যান্সার হয়েছে।



চিত্র 12 ঃ মেসোথোরিয়াম রঙ নিয়ে কর্মরত শ্রমিকের সামনে মৃত্যুদূত উপস্থিত।

rays) স্থান। চোখের ওপরই এই রশ্মির প্রভাব সর্বাধিক, তা ছাড়া চর্মের ওপরেও এর প্রভাব আছে। এই রশ্মির ভয়েই খালি চোখে সূর্য্যের দিকে তাকাতে বারণ করা হয়, এমন কি অ্যান্টি-গ্লেয়ার স্ক্রীণ না লাগিয়ে টেলিভিশন দেখাও উচিৎ নয়। অস্ত্রোপচার কক্ষ জীবাণু মুক্ত করতে বা পুরাতন ক্ষত নিরাময়ের জন্য কখনো কখনো কৃত্রিম অতিবেগুনী রশ্মি ব্যবহার করা হয়। ইলেকট্রিক্ ওয়েল্ডিং বা আর্ক ওয়েল্ডিং করার সময় ওয়েল্ডারদের চোখে অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে যন্ত্রনাদায়ক কনজাংটিভাইটিস্ হয়, এমন কি ম্যাকুলার বার্নও হতে পারে। যে কোন ইলেকট্রিক ওয়েলডারকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন তাঁরা এই রোগগুলি সম্বন্ধে সচেতন এবং ভাবে না হলেও ভয়ে কালো চশমা বা ওই জাতীয় চক্ষু আচ্ছাদন ব্যবহার করেন, মুশকিল হয় কৌতূহলী দর্শকদের।

৩নং তালিকা : অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাব

200-300	ন্যানোমিটার	তরঙ্গ	দৈর্ঘ্যে—	জীবাণু ধ্বংস হয় (সর্বাধিক 230 nm-এ)
250-310	,,	,,	,,	চোখে কনজাংটিভাইটিস হয় (288 ,, ,,)
240-275 290-310	,,	,,	,,	চামড়া লাল হয়ে যায়।
290-310	,,	,,	,,	চর্ম-ক্যান্সার হতে পারে।
310	,,	,,	,,	কর্নিয়াল আলসার হতে পারে।

শরীরের ওপর অতিবেগুনী রশ্মির পরোক্ষ প্রভাবও যথেষ্ট। 250 এর কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অতিবেগুনী রশ্মি বাতাসের নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন থেকে যে নাইট্রোজেন অক্সাইড গ্যাস তৈরী করে তা ওয়েলডারদের পক্ষে ক্ষতিকারক।

(4) **অবলোহিত রশ্মির প্রভাবে পেশাগত ব্যাধি**—১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে হেস্টার উত্তাপের সঙ্গে চোখে ছানির সম্পর্কের উল্লেখ করেন। বস্তুত কাঁচ, লোহা ইত্যাদি পদার্থ 1500° সেন্টিগ্রেড উত্তাপে যখন গলিত অবস্থায় থাকে তখন সেখান থেকে অত্যুজ্জ্বল দৃশ্যালোক এবং তাপ ছাড়াও শতকরা 20 ভাগ অবলোহিত রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। পরবর্তী গবেষণায় জানা গেছে তাপ নয়, এই অবলোহিত রশ্মির প্রভাবেই অল্প বয়সে চোখে ছানি পড়ে। অবলোহিত রশ্মির ক্ষতিকারক তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সীমা 950 থেকে 1500 ন্যানোমিটার। সাধারণ তাপ রশ্মি থেকে এর ভেদক ক্ষমতা অনেক বেশী। অবলোহিত রশ্মি

লেগে চর্মতল তো উত্তপ্ত হয়ই তা ছাড়াও উত্তাপ প্রায় 5 মি. মি. পরিমাণ চর্মগভীরে প্রবেশ করে এবং চোখের কর্নিয়া ও লেন্স ভেদ করে ভিট্রাস হিউমারে পৌঁছে যায়। তাই লেন্সের পশ্চাৎ মেরুতেই এর প্রভাবে ছানি পড়তে শুরু করে বেশী। লোহার কারখানা বা কাঁচশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক 10-15 বছর এই জাতীয় উত্তপ্ত বস্তুর দিকে তাকিয়ে কাজ করতে করতে যে ছানিতে ভোগেন তার নামই দেওয়া হয়েছে Glass Blowers Cataract।

(5) **তেজস্ক্রিয় পদার্থ সংশ্লিষ্ট পেশার কুফল**—পূর্বেই বলা হয়েছে, অতিবেগুনী রশ্মির নীচে, 2·5 ন্যানোমিটারের কম দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তড়িৎচুম্বক তরঙ্গগুলি পরমাণু থেকে ঋণাত্মক ইলেকট্রন বার করে দিয়ে আয়নে পরিণত করতে পারে বলে তাদের আয়নিক বা তেজস্ক্রিয় বিচ্ছুরণ বলে। যে সব প্রাকৃতিক মৌল থেকে এগুলি নির্গত হয় তাদের এবং সমধর্মী কয়েকটি কৃত্রিম মৌলকে (Radio Isotopes) তেজস্ক্রিয় পদার্থ বলা হয়।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কোনরাড উইলহেম রঞ্জেন কর্তৃক একস্-রে এবং ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কুরী দম্পতি কতৃক রেডিয়াম আবিষ্কারের ফলে নতুন করে আরও একবার মনুষ্য সভ্যতার বিজয়বার্তা ঘোষিত হল, কিন্তু তারই সঙ্গে দেখা দিল এক সর্বনাশা বৃত্তিজ ব্যাধি-শরীরের ওপর তেজস্ক্রিয়তার প্রতিক্রিয়া, যার মধ্যে আবার সবচেয়ে' মারাত্মক হল ক্যান্সার। নাবিক, চাষী প্রভৃতি যে সব উপজীবীদের প্রতিনিয়ত রোদে কাজ করতে হয়, সূর্য্যের তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রভাবে তাঁদের উন্মুক্ত অঙ্গে ক্যান্সার হতে পারে; কিন্তু রেডিয়াম, থোরিয়াম, লিথিয়াম, ইউরেনিয়ম প্রভৃতি প্রাকৃতিক মৌল অথবা রেডিও আইসোটোপ এবং একস্ রে, গামা রে প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় বিচ্ছুরণ আবিষ্কারের পর চিকিৎসা শাস্ত্রে এবং বিভিন্ন শিল্পে এগুলির ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়েছে। স্বতই এই সব পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের শরীরের ওপর কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব বেড়ে যাচ্ছে। এক গামা রশ্মির ব্যবহারই কত বহুমুখী। প্লাস্টিক তৈরী করতে, খাদ্য ও চিকিৎসার যন্ত্রাদি জীবাণুমুক্ত করতে, ক্যান্সারের চিকিৎসায় এই রশ্মিকে কাজে লাগান হয়। রঞ্জেন রশ্মির ব্যবহারের তো কথাই নেই। ধাতু প্রযুক্তিতে, রোগ নির্ণয়ে, রোগ নিরাময়ে, শুল্ক বিভাগ বা পুলিশের কাজে এমনকি বিমান ছিনতাইকারীর পকেট সার্চ করতে এর ব্যাপক ব্যবহার। হিসাব করে দেখা গেছে ইংলণ্ড ও ওয়েলসে

এই জাতীয় কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ জনা পিছু গড়ে বাৎসরিক ২৫ রেম (REM = Radiation Equivalent Man)। সমস্যাটি যে কত গভীর একটি উদাহরণ থেকেই বোঝা যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ঘড়ির ডায়েল উজ্জ্বল করতে রেডিয়াম বা মেসোথোরিয়াম নামে তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিচ্ছুরক পদার্থ ব্যবহার করা হত। এক সময় কেবল যুক্তরাষ্ট্রেই এই পেশায় নিযুক্ত কর্মী সংখ্যা ছিল ন্যূনাধিক আট শত। এঁদের অনেকের বদ অভ্যাস ছিল রঙ করতে করতে তুলিটা মাঝে মধ্যে জিভ দিয়ে সরু করে নেওয়া এবং তার ফলে তাঁরা প্রায়ই রক্তাল্পতা, আগ্রানুলোসাইটোসিস অথবা হাড়ের ক্যান্সারে আক্রান্ত হতেন। এমনকি এই প্রক্রিয়ার আবিষ্কারক সচোকি (এস. এ. ভন সচোকি) ক্যান্সারেই মারা যান। জনমতের চাপে পেশাটি অবশ্য পরে বন্ধ হয়ে যায়।

তেজস্ক্রিয়াজনিত পেশাগত ব্যাধি বিজ্ঞানীদেরও ক্ষমা করে না। রন্‌জেন সাহেবের প্রিয় সহকারীর দুটো হাতই নাকি রেডিয়েশন লেগে নষ্ট হয়ে গেছল। একস্-রে নিয়ে যে সব রেডিও থেরাপিস্ট, রেড়িওলজিস্ট, টেকনিশিয়ান বা অস্থিবিশারদদের প্রায়ই কাজ করতে হয়, তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রভাবে তাঁদের মধ্যে রক্তাল্পতা, বন্ধ্যাত্ব, বা ক্যান্সার দেখা দিতে পারে। কোন এক প্রখ্যাত রেডিওলজিস্টকে ক্যান্সারের জন্য হাত হারাতে হয়েছিল, কলকাতার এক নামকরা অস্থিবিশারদের হাতের আঙুল বাদ দিতে হয়েছে একই কারণে। পরমানবিক চুল্লী বা ওই জাতীয় শিল্পে যাঁরা কাজ করেন তাঁদেরও রেডিয়েশন জনিত বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ভয় আছে।

পরমাণু থেকে আয়ন উৎপন্ন করতে কমপক্ষে 12 Electron volt (সংক্ষেপে eV, $1\ eV = 1{\cdot}6 \times 10^{-12}$ আরগ্) শক্তির প্রয়োজন। প্রধানত যে তিনটি কণা এবং দুটি তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গ এই শক্তি উৎপন্ন করে মৌলকে আয়নিত করতে পারে তাদের কথা নিম্নে বলা হল।

আলফা কণা-এই ধনাত্মক আধানবাহী কণাগুলি তুলনায় বেশ ভারী এবং এরা সেকেণ্ডে 12000-18000 মাইল বেগে ধাবমান হিলিয়াম নিউক্লিয়াস। প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে এদের উৎপত্তি। কিন্তু এদের ভেদক ক্ষমতা খুব কম, একটা কাগজের মত পাতলা বস্তুও এরা ভেদ করতে পারে না। সুতরাং বাইরে থেকে আক্রমণ করে এরা শরীরের

ক্ষতি করতে অপারগ ; গমন পথে শক্তি সংগ্রহ করলে, যাকে ইংরাজিতে বলে "এনারজাইসড্", অথবা শরীরের মধ্যেই এগুলি তৈরী হলে অবশ্য অন্য কথা।

বিটা কণা—আসলে এগুলি ঋণাত্মক আধানবাহী ইলেকট্রন। এদের উৎস হল পরমাণু নিউক্লিয়াস। এখান থেকে গামা রশ্মির সঙ্গে প্রায় আলোকের গতিবেগে বিচ্ছুরিত হবার পরেই এদের চলার ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পায়, তাই এদের ভেদক ক্ষমতাও বেশী নয়।

নিউট্রন কণা—বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ এই কণাগুলি পরমাণু নিউক্লিয়াস থেকে বিচ্ছুরিত হয়। এদের ভেদক ক্ষমতা যথেষ্ট বেশী। রেডিও আইসোটোপ তৈরী করতে বা কোন বস্তুর বেধ মাপতে বিভিন্ন শিল্পে এগুলি ব্যবহৃত হয়।

রঞ্জেন রশ্মি বা একস্-রে—এই তড়িৎ চুম্বক তরঙ্গের গতিবেগ আলোকের গতিবেগের সমান। বায়ুশূন্য পরিবেশে দ্রুত ধাবমান ইলেকট্রন রশ্মি ধাতু-পাতে প্রতিফলিত হয়ে রঞ্জেন রশ্মি তৈরী করে। ভেদক ক্ষমতা অনুযায়ী এদের (১) নরম (soft) এবং (২) কঠিন (hard) এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। আজকাল যে সব নতুন নতুন একস্-রে যন্ত্র তৈরী হচ্ছে তাতে ভোল্টেজ (voltage) না বাড়িয়ে ছয় স্পন্দন (six pulse) বিশিষ্ট কঠিন একস্-রে তৈরী সম্ভব হচ্ছে। আগেকার যন্ত্রগুলিতে দুই স্পন্দন সমন্বিত নরম একস্-রে উৎপন্ন হত ; সেগুলি রোগীর শরীরাভ্যন্তরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে ছবি তোলার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর কলা ও কোষের প্রভূত ক্ষতিও করত। কঠিন একস্রে আবিষ্কারে সে সম্ভাবনা কমে গেছে।

গামা রশ্মি—এটি প্রায় রঞ্জেন রশ্মির সহধর্মী, তবে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অনেক কম। কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় কোবল্ট, ইরিডিয়াম, সিসিয়াম, থুলিয়াম ও স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয় রেডিয়াম ইত্যাদি মৌল এবং অন্য বেশ কিছু কৃত্রিম ভাবে গড়া আইসোটোপ থেকে এগুলি উৎপন্ন হয়। এই সব পদার্থের তেজস্ক্রিয়তার পরিমাপ করা হয় "কুরী" একক দিয়ে (1 কুরী একক পদার্থে $3{\cdot}7 \times 10^{10}$ সংখ্যক পরমাণু থেকে আয়ন তৈরী হয়)।

শরীর কোষ, তথা কলার ওপর তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব দ্বিবিধ, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ উপায়ে এগুলি কিভাবে জীবকোষের ক্ষতি করে সে সম্বন্ধে দুটি মতবাদ প্রচলিত। প্রথমটিতে বলা হয় যে শরীর ভেদ করে যখন তেজস্ক্রিয় রশ্মি বা কণাগুলি অগ্রসর হতে থাকে তখন এদের গতিপথে

যে কোষ পড়ে এরা তাকেই টার্গেটের মত বিদ্ধ করে। জীবকোষের ছোট বড় সব অনুই এইভাবে আহত হতে পারে এবং সেখানে রাসায়নিক বিক্রিয়া শুরু হয়। এনজাইমের মত ছোটখাট অণু তেজস্ক্রিয় কণা বা রশ্মির দ্বারা বিদ্ধ হলে কোষের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না কারণ, এগুলি প্রতিস্থাপনীয়; কিন্তু "জিন" এর মত বড় অণু ধ্বংস বা বিকৃত হলেই মুশকিল, কারণ কোষের ক্রিয়াকলাপ বা তার বংশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে জিনের ওপর। লক্ষনীয়, কোষ ধ্বংস করে, তাই ক্যান্সার চিকিৎসায় যেমন এই সব রশ্মি ব্যবহার করা হয় তেমনি "জিন" এর পরিব্যক্তি বা ম্যুটেশন ঘটিয়ে এরা ক্যান্সার সৃষ্টিও করে বলে এদের "ম্যুটাজেন" পর্যায়ভুক্ত করা হয়। তেজস্ক্রিয় রশ্মি বা কণার ক্ষতিকারক ক্ষমতা সম্বন্ধে দ্বিতীয় মতবাদ হল এই যে এদের প্রভাবে কোষের জলীয় অংশ থেকে হাইড্রোজেন পারকসাইড্ (H_2O_2), HO_2, HO_3 প্রভৃতি বিষাক্ত পদার্থ তৈরী হয়ে "জিন" এর মৃত্যু বা পরিব্যক্তি ঘটে। যে কোন মতবাদেই অবশ্য এটা অনস্বীকার্য্য যে তেজস্ক্রিয়ার পরিমাপের ওপরই জীবকোষের ক্ষয় ক্ষতি নির্ভর করে।

৪নং তালিকা: টিস্যু কালচারে সংরক্ষিত কোষের বিভাজন, অবক্ষয় এবং মৃত্যুর ওপর তেজস্ক্রিয়ার প্রভাব

তেজস্ক্রিয় রশ্মি	পরিমাণ (রঞ্জেন এককে)	প্রভাব
গামা	33	কেবল বিভাজনের হার কমে যায়
একস্-রে	500	বিভাজন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় এবং 7% কোষ 3 ঘণ্টায় মরে যায়।
"	2500	শতকরা 50টি কোষ 3 ঘণ্টায় মরে যায়
"	10,000	" 75 " " " " "
গামা	54,000	8 দিনে সব কোষের মৃত্যু ঘটে।
"	1,17,000	সবকোষ তৎক্ষণাৎ মরে বায়।

শরীরে তেজস্ক্রিয়ার পরোক্ষ প্রভাবে সংযোজক কলা এবং রক্তবাহী নালীগুলি কার্য্যকারিতা হারিয়ে ফেলে, ফলে কোষগুলি খাদ্য এবং অক্সিজেনের অভাবে মরে যায়। অবশ্য সবজাতীয় কোষের ওপরই যে তেজস্ক্রিয়ার প্রভাব

সমান তা নয়। বারগোনি ও ত্রাইবিন্দু (Bergonie and Tribondeau) বলেন, কোষ বিভাজনের প্রস্তুতি পর্বে এবং বিভাজনের প্রথম পর্য্যায়ে তেজস্ক্রিয়ার প্রভাব সর্বাধিক। এই সূত্রানুযায়ী রক্তের লিমফোসাইট, লিমফোব্লাস্ট, মজ্জার রক্ত উৎপাদনকারি কোষ, পাকস্থলী ও অন্ত্রের ঝিল্লি-কোষ, জননগ্রন্থি এবং চর্মের কোষগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সর্বাধিক অথচ পেশী বা স্নায়ুকোষের ওপর তেজস্ক্রিয়ার বিশেষ কোন প্রভাব নেই। তাই তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিয়ে যাঁরা কাজকর্ম করেন তাঁদের যে সব রোগ দেখা যায় তার মধ্যে চর্মদহন, চুল উঠে যাওয়া, রক্তাল্পতা, রক্তে শ্বেত কণিকা কমে যাওয়া বা বন্ধ্যাত্ব এবং ক্যান্সার দেখা দেবার সম্ভাবনা। আরও কম পরিমাণ তেজস্ক্রিয়ার প্রভাবে শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষুধামান্দ্য, বমির ভাব, দুর্বলতা, কোষ্ঠ তারল্য ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়।

কিন্তু বিজ্ঞানের কাছে সমস্যার চেয়ে সমাধানটাই বড়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে এমিলিও তিরোবিশি (Emilio Tirobishi) নামে এক রেডিওলজিস্টের মৃত্যু ঘটলে মানুষ প্রথম জানতে পারল পেশা এবং একস্‌রের বিধ্বংসী ক্ষমতার সম্বন্ধ, তারা সাবধান হতে শিখল। হান্টারের উদ্ধৃতিতে "The human experiment have been made, the tragic result of calusness demonstrated and the measures necessary for adequate protection are known and available to any one who cares to learn them." (মানুষের ওপর পরীক্ষা হ'ল, ঔদাসীন্যের মর্মন্তুদ পরিণতিও দেখা গেল এবং নিরাপত্তার উপযুক্ত ব্যবস্থাদি জানা আছে, যে শিখতে চায় সে শিখতে পারে।) তারপর থেকে যেমন নতুন নতুন তেজস্ক্রিয় রশ্মি বা কণা আবিষ্কার হয়েছে, শিল্পে এবং প্রযুক্তিতে তাদের ব্যবহারও ব্যাপ্ত হচ্ছে, তেজস্ক্রিয়া জনিত কুফল প্রতিরোধকল্পে ব্যবস্থাদিও বাড়ছে। দেখা গেছে সীসার পাত একস-রে-অভেদ্য, তাই ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই স্বচ্ছ সীসা মিশ্রিত কাঁচ (Lead glass) দিয়ে একস্‌রে টিউব আচ্ছাদিত রাখা শুরু হয়েছে। এবং ১৯০৩ সাল থেকে রেডিওলজিস্টদের প্রতিরক্ষার জন্য সীসা মিশ্রিত রবারের বহির্বাস, দস্তানা ইত্যাদি ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়েছে। ইদানীং তাঁদের শরীরে কতটা তেজস্ক্রিয় রশ্মি লাগছে জানবার জন্য এঁরা ফিলিম ব্যাজ পরছেন। যে ঘরে তেজস্ক্রিয় রশ্মি নিয়ে কাজ হয় সেগুলি তৈরীর সময় বালি-

সিমেণ্টের সঙ্গে তেজস্ক্রিয় রশ্মি রোধক বেরিয়াম যৌগ মিশিয়ে নেওয়া হচ্ছে যাতে রশ্মিগুলি কোনক্রমেই ঘরের বাইরে গিয়ে সমস্ত পরিবেশ তথা কর্মীদের দূষিত না করে। নতুন নতুন যন্ত্র বেরচ্ছে যাতে সেখান থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মিগুলি এলোমেলো না হয়ে একমুখী বা অভিসারী হয়, তাদেরও উপযুক্ত আচ্ছাদনের বন্দোবস্ত করা হচ্ছে।

১৯২৫ সালে আন্তর্জাতিক রেডিওলজিকাল ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এঁরাই প্রথম সুসংবদ্ধ ভাবে তেজস্ক্রিয়তার কুফল প্রতিরোধের ভাবনা চিন্তা শুরু করেন। এই সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল ১৯২৮ সালে রঞ্জেন একক অথবা শরীরে শোষিত তেজস্ক্রিয়ার পরিমাপে RADIATION ABSORBED DOSE (সংক্ষেপে RAD, 1 রাড = 100 আরগ/গ্রাম) এককের ব্যবহার। ওই সালেই তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিয়ে কর্মরত শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য International Commission for Radiological Protection (ICRP) প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য তখনও বিজ্ঞান এ ব্যাপারে পূর্ণ উদ্যম প্রয়োগ করে নি। কিন্তু ১৯৪৫ সালের ৮ই আগষ্ট এমন এক অঘটন ঘটে গেল যে বিজ্ঞানীদের টনক নড়ল ভীষণভাবে; ব্যাপারটা অবশ্য আমাদের আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক হতে পারে, কারণ হিরোশিমায় পরমানবিক বোমা ব্যবহার করা হয়েছিল পেশায় নয়, মারণযজ্ঞের নেশায়। ১৯৫৮ সালের আন্তর্জাতিক কমিশন সুপারিশ করলেন ১৮ বছরের উর্ধ্ব বয়স্ক ব্যক্তিদের শরীরে পেশাগত তেজস্ক্রিয়তা যেন কোন ক্রমেই 5 × (বয়স-18) রেমের উর্ধ্বে না হয়। এর পর আরও আইন কানুন হয়েছে (বিলাতের ১৯৬৮ ও ৬৯ সালের আওনাইজিং রেডিয়েশন রেগুলেশন দ্রষ্টব্য)। আমাদের দেশে হয়ত তেজস্ক্রিয়তার সমস্যা খুব গভীর নয়, কিন্তু যে সব দেশে সামান্য একটা ডিম পচা কিনা জানতে বা চোরা চালানকারী জুতোর হিলে সোনা পাচার করছে কিনা জানতে একস-রে ব্যবহার করা হয়, তাদের কাছে সমস্যা কতই না গভীর!

(খ) অন্যান্য ভৌত কারণে পেশাগত ব্যাধি

তড়িৎ চুম্বক তরঙ্গ জনিত শারীরিক ক্ষতি ছাড়াও, কেবলমাত্র বিদ্যুৎ প্রবাহে যে ক্ষতি হতে পারে সে অভিজ্ঞতা অল্প বিস্তর সকলেরই আছে। প্রধানত দুরকম বিদ্যুৎ প্রবাহ, যথা প্রাকৃতিক অর্থাৎ বজ্র বিদ্যুৎ এবং কৃত্রিম, এই দুটি বিষয়ই আলোচিত হবে। সাধারণত উন্মুক্ত প্রান্তরে কর্মরত শ্রমিকরা ঝড় বৃষ্টিতে নারকেল, সুপারী প্রভৃতি উঁচু গাছের তলায় আশ্রয় নিলে বজ্রাহত হতে পারেন। একবার মাত্র বজ্রপাতে ১-৪১টি বিদ্যুৎ তরঙ্গের আঘাত ঘটতে পারে এবং সব মিলিয়ে শরীরের ওপর কুড়ি হাজার অ্যাম্পিয়ারের কাছাকাছি প্রবাহ 30×10^{-6} সেকেণ্ড কাজ করে। বজ্রের ভোল্টেজ প্রায় ১০০-১০০০ মিলিয়ন ভোল্ট। আমরা জানি সম আধান বিশিষ্ট স্থির বিদ্যুৎ পরস্পরের কাছ থেকে বিকর্ষিত হয়, বজ্রাহতের শরীরের বিভিন্ন অংশে, এমন কি জামা কাপড়ের ওপর এই বিচ্ছেদক শক্তি কাজ করে এবং এর জন্য মস্তিস্কের ক্ষতি হয় সর্বাধিক। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মৃত্যুও অবধারিত। তবে সুবিধা এই যে বজ্রবিদ্যুৎ প্রবাহ যত মাটির দিকে নামতে থাকে (মাটির বিদ্যুৎ আধান শূন্য বলে) ততই চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং ভোল্টেজ কমতে কমতে মাটিতে পৌঁছে শূণ্যে পরিণত হয়। বট ইত্যাদি প্রচুর শাখা পল্লব বিশিষ্ট গাছ ভোল্টেজের এই অবমূল্যায়নে সাহায্য করে। নিরুপায় ব্যক্তিদের উচিৎ বজ্রপাতের সময় অন্তত মাটিতে শুয়ে পড়া। মৃত্যু না ঘটলেও বজ্রপাতে শরীরের অন্যান্য ক্ষয় ক্ষতি কিছু কম হয় না। পুড়ে যাওয়া, অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি ছিঁড়ে যাওয়া, হাড় ভাঙ্গা, চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়া, পক্ষাঘাত এবং মাথায় টাক পড়ে যাওয়া বজ্রাঘাতের ফলশ্রুতি। অবশ্য বজ্রাঘাতে অন্ধ ব্যক্তি দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে বা মস্তিষ্ক বিকৃতি ভাল হয়ে গেছে এরকম কথাও ক্বচিৎ কখনও শোনা যায়।

(১) আকাশের বিদ্যুৎকে মানুষ বহুদিনই নিজের আয়ত্বে আনবার চেষ্টা করেছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন্ তো এই করতে গিয়ে একবার মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিলেন। তার পর লাইডেন, গ্যালিভানি, ভোল্টা, প্রভৃতি মনীষীদের চেষ্টায় একদিন পরীক্ষাগারে “পড়িল ধরা অশনি ভরা বিদ্যুৎ”। পরবর্তীকালে ফ্যারাডে, এডিসন প্রমূখ বিজ্ঞানীরা বিদ্যুৎ প্রযুক্তিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ, ১৮৩১

সালে ডায়নামো আবিষ্কার করে ফ্যারাডে তখন জগৎ বিখ্যাত। একদিন বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন্ এলেন তাঁর পরীক্ষাগার পরিদর্শনে। ফ্যারাডে তাঁকে গ্যালিভানির ব্যাঙ নাচান পরীক্ষা দেখাতে গ্ল্যাডষ্টোন জিজ্ঞাসা করে-ছিলেন, ব্যাঙ না হয় নাচল, কিন্তু বিদ্যুতে দেশের কী উপকার হবে ? উত্তরে নাকি ফ্যারাডে বলেছিলেন "Mr. Prime minister, one day this will fill up the British exchaquer" (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আশাকরি একদিন এই বিদ্যুতের দৌলতে ব্রিটিশ রাজকোষ ভরে উঠবে)। ফ্যারাডের সেই ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে ; আজকের মনুষ্য সভ্যতা যে বিদ্যুৎ নির্ভর এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না। বাহু পেশাতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে হয়, সুতরাং বিদ্যুৎপৃষ্ট হওয়াটা ওই সব পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে খুবই সাধারণ ঘটনা। আজকাল "ডিরেকট কারেন্ট" এর ব্যবহার প্রায় উঠে গেলেও এখনও আমাদের দেশে বাড়িতে বাড়িতে বা কয়েকটি শিল্পে ওই জাতীয় বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। সৌভাগ্য বশতঃ এই কারেন্টে পুড়ে যাওয়া ছাড়া আর বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। বিভিন্ন শক্তির (ভোল্টেজ) এ. সি. বা "অলটারনেটিং কারেন্টে"-এর ব্যবহারই শিল্পে, গৃহস্থালীতে সর্বাধিক।

৫নং তালিকা : দৈনন্দিন জীবনে বিদ্যুতের ব্যবহার

আমেরিকায় গ্রামোফোন, ইত্যাদি সৌখিন যন্ত্র চালাতে প্রায়	110 ভোল্ট
আমাদের বাড়ির আলো, ফ্যান ,, গৃহস্থালীর ,, ,, ,,	210-250 ,,
বাড়ি বা কারখানার মোটর ,, ,, ,, ,,	400-440 ,,
ট্রাম গাড়ী চালাতে ট্রামের তারে	500 ,,
ইলেকট্রিক ট্রেন চালাতে ওভারহেড্ তারে	2500 ,,
শহর বা গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পাইলনের তারে	60,000 ,,

আমাদের দেশে জনসাধারণের মনে একটা ধারনা আছে যে ডি. সি. কারেন্ট মানুষকে ঠেলে ফেলে দেয় আর এ. সি. কারেন্ট টেনে নেয়। কথাটা কিন্তু আংশিক সত্য, কারণ সত্যিই আমাদের বাড়িতে বাড়িতে যে ভোল্টেজে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় তা এ. সি. বা ডি. সি. যাই হোক, তার শকে মানুষ ঝাঁকুনি খেয়ে দূরেই সরে যায় (Let-off current) কিন্তু বেশী ভোল্টেজের এ. সি. কারেন্ট মানুষকে টেনে নেয়, যার জন্য একে বলা হয় হোল্ড অন কারেন্ট (Hold-on current)।

পরিসংখ্যান করে কতটা বিদ্যুৎ শরীরের কতটা ক্ষতি করে তাও খতিয়ে দেখা হয়েছে।

৬নং তালিকা ঃ

12-20 ভোল্ট-	0.4 মিলি অ্যামপ্ কারেণ্টে	কিছুই বোঝা যায় না।
	1.1 ,, ,, ,,	চিন্‌চিন্ করে। (যেমন টেলিফোনের তার)
	9.0 ,, ,, ,,	শক্ লাগে, কিন্তু পেশী নিয়ন্ত্রণ হারায় না।
	16.0 ,, ,, ,,	শক্ লেগে পেশী সঙ্কুচিত হয়।
25 ভোল্ট—23.0	,, ,, ,,	প্রচণ্ড শক্ লাগে, শ্বাসকষ্ট হয়।
60–100 ,,—100.0	,, ,, ,,	তিন সেকেণ্ডে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়।

সাধারণ ভোল্টেজের ইলেকট্রিক শক্ লাগলে শরীরের কি ক্ষতি হয় তার সম্যক পরিচয় মেলে মানসিক রোগ চিকিৎসায় যখন রোগীদের ইলেকট্রিক শক দেওয়া হয়*। শক লাগলে শরীর অবসন্ন হয়ে এলিয়ে পড়ে, পুড়ে অথবা মাংসপেশী ও সন্ধিবন্ধনী ছিঁড়ে যাওয়ার ফলে সারা অঙ্গে প্রচণ্ড বেদনা অনুভূত হয়, হাড় ভেঙে যেতে পারে। শক লাগার পরে দূর ভবিষ্যতে স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, স্মৃতিভ্রংশতা বা হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়াও বিচিত্র নয়।

যে সব পেশায় উচ্চ ভোল্টেজের বিদ্যুৎ প্রবাহ নিয়ে কাজ করতে হয় সে ক্ষেত্রে কতগুলি সাধারণ আইনকানুন মেনে চলা উচিৎ। বিদ্যুৎ কুপরিবাহী রবারের দস্তানা পরে বা শুকনো কাঠের ওপর দাঁড়িয়ে কাজ করা বিধেয়। যন্ত্রপাতিগুলিও অন্তরিত (Insulated) হওয়া দরকার। প্রসঙ্গত, আমাদের দেশে সমাজবিরোধীদের মধ্যে ট্রেনের বা বিদ্যুৎ সরবরাহের তার চুরি করা একটি প্রিয় পেশা। তারা সাধারণত এই সব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়ে থাকে, কিন্তু তাড়াহুড়োয় ভুল হয়ে যায় আর প্রায়ই তাদের মৃত্যু সংবাদ কাগজে বের হয়। বিদ্যুৎপৃষ্ঠ ব্যক্তিকে কখনও টেনে সরাবার চেষ্টা করা উচিৎ নয়। বরঞ্চ যে কোন রকমে বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করে

* ১৯৮১ সালে জলমগ্ন কলকাতা শহরে ইলেকট্রিক্যুশনের এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় কিছু ভুক্তভোগীর অভিজ্ঞতাও প্রণিধানযোগ্য।

দিতে হবে। শর্ট সারকিট (short circuit) হয়ে আগুন লাগলেও জল দিয়ে আগুন নেভাবার চেষ্টা না করে প্রথমেই ওই উপায় অবলম্বন করা উচিৎ।

(২) উচ্চ বায়ুচাপ সংক্রান্ত পেশার কুফল (Decompression sickness, Caissons disease)-পেশার খাতিরে মানুষ জল, স্থল, অন্তরীক্ষ বা মহাকাশ, কোন অভিযানই বাকি রাখেনি। বহু যুগ ধরেই ভারত ও জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি দূর প্রাচ্যের কিছু নরনারী রত্নাকরে ডুব দিয়ে মুক্তা, প্রবালাদি মণিমাণিক্য আহরণের পেশা বেছে নিয়েছে। আধুনিক অ্যাকোয়া-লাঙ (aqua lung) প্রভৃতি কোন যন্ত্রের সাহায্য না নিয়েই এরা সমুদ্রে ঝাঁপ দেয়। পুকুর বা পাতকুয়া থেকে জিনিসপত্র উদ্ধারের জন্য কিছু লোক আজও এই দুঃসাহসিক পেশায় নিযুক্ত দেখা যায়। সাধারণতঃ এরা জলের তলায় 75 ফুটের বেশী গভীরে যায় না এবং সেখানে 1 থেকে $1\frac{1}{2}$ মিনিটের বেশী থাকে না। নিয়োগকারীর প্ররোচনায় বা অর্থের লোভে এর ব্যতিক্রম হলে অনেক সময় অজ্ঞান অবস্থায় এদের জল থেকে টেনে তুলতে হয় বা ডাঙায় ফিরে ডুবুরীর নাক, কান, মুখ থেকে অথবা কাশির সঙ্গে রক্ত পড়ছে বা রক্ত বমন হচ্ছে এও দেখা গিয়েছে।

কালক্রমে আবিষ্কার হল ডুবুরীর পোষাক। এ পোষাকের বৈশিষ্ট্য হল মাথা থেকে গলা পর্য্যন্ত এক বিশেষভাবে তৈরী শিরস্ত্রাণে ঢাকা থাকে যার মধ্যে জলের বাইরে থেকে উচ্চচাপে বাতাস পাম্প করে রাখা হয়, ডুবুরীর শ্বাস প্রশ্বাসের সুবিধার জন্য। সাধারণত জলের তলায় প্রতি 33 ফিট্ গভীরে নামার জন্য 15 পি. এস. আই (প্রতি বর্গইঞ্চি পরিমাণ স্থানে পাউণ্ড চাপ) বাতাস থাকে।

১৮৫১ সালে হিউজ জলের তলায় সেতুস্তম্ভের ভিত করতে "কেসন" (Caisson) নামে একরকম বায়ুবদ্ধ খাঁচা আবিষ্কার করলেন, যার মধ্যে নেমে শ্রমিকরা কাজ করত। খাঁচাটিতে বায়ু ভরা থাকে উচ্চ চাপে। শ্রমিককে 6 থেকে 8 ঘণ্টা কাজ করতে হলে কেসন অভ্যন্তরে 35 পি. এস. আই এবং ঘণ্টা দু' একের কাজে 45 পি. এস. আই চাপ বজায় রাখা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আজকাল জেট চালিত যাত্রিবাহী এরোপ্লেনগুলি 30 থেকে 40 হাজার ফুট উঁচু দিয়ে উড়ে যায় বলে প্লেনের অভ্যন্তরে বায়ুচাপ কিছুটা বাড়িয়ে নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়; প্লেন নেমে আসার সময় অর্থাৎ যখন স্বাভাবিক চাপে পুনঃ প্রবেশ

করে তখন হঠাৎ বায়ুচাপের তারতম্যে কানে যে প্রচণ্ড ব্যথা হয় তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। স্পেস ক্যাপসুলেও একই নিয়ম অনুসরণ করা হয়।

উপরে বর্ণিত উচ্চচাপ পরিবেশে কাজ করার সময় বায়ুর নাইট্রোজেন অংশ রক্ত রসে অধিক পরিমাণে দ্রবীভূত হয়ে পড়ে তারপর কাজের শেষে যখন শ্রমিকরা স্বাভাবিক চাপে ফিরে আসে তখন এই নাইট্রোজেনও রক্তরস থেকে মুক্ত হয়ে পড়ে। যদি ধীরে ধীরে, সইয়ে-সইয়ে স্বাভাবিক চাপে পুনঃপ্রবেশ করা যায় তা হলে মুক্ত নাইট্রোজেন প্রশ্বাস বায়ুর (Expired air) সঙ্গে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়, কিন্তু যদি পুনঃপ্রবেশটা তড়িঘড়ি ঘটে যায় তাহলে রক্তে নাইট্রোজেনের বুদ বুদ সৃষ্টি হয়ে মস্তিষ্ক, সুষুম্না কাণ্ড, হৃদপিণ্ড, অন্ত্র, বৃক্ক, অস্থি প্রভৃতি যন্ত্রের অনুধমনীতে (art,riole) রক্ত চলাচল বন্ধ করে দেয়। এর ফলে 12 থেকে 14 ঘণ্টার মধ্যে শ্রমিকদের সারা অঙ্গে বেদনা শুরু হয়, তার পর ধীরে ধীরে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি অসাড় হয়ে আসে, পক্ষাঘাত, হৃদরোগ, অস্থির পচন (Bone necrosis) (২১নং চিত্র দ্রষ্টব্য) ইত্যাদি দেখা দেয়। এমনকি মৃত্যু ঘটাও আশ্চর্য্য নয়।

বাতাসের অক্সিজেন অংশ নিয়ে কিন্তু এ সব সমস্যা দেখা দেয় না। কারণ উচ্চচাপে রক্তের হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে অক্সিজেনের যৌগতা বেড়ে যায়, এবং অক্সি-হিমোগ্লোবিন যৌগটি ভাণ্ডারের কাজ ক'রে রক্তরসে অক্সিজেনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত রাখে (চতুর্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। বস্তুত আজকাল কয়েকটি রোগের চিকিৎসায় রোগীকে উচ্চচাপের অক্সিজেন (Hyperbaric Oxygen) তাঁবুতে রাখার কথা বলা হচ্ছে। বায়ুচাপজনিত পেশাগত ব্যাধি প্রতিকারের উপায় হল, কাজ শেষে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক বায়ুচাপে পুনঃ প্রবেশ। তা সত্ত্বেও যদি প্রাথমিক উপসর্গ দেখা যায় তবে শ্রমিককে পুনরায় উচ্চচাপে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।

(৩) তাপ সংক্রান্ত পেশার কুফল—দমকল শ্রমিক, "বয়লারে যারা কয়লা জোগায়, আগুন জাগায় গহ্বরে", গলিত ধাতু বা কাঁচের মুখোমুখি যাঁরা কাজ করেন, রুক্ষ চেহারা এবং আগুনে ঝলসান তামাটে রঙ দেখে তাঁদের চিনতে অসুবিধা হয় না। গভীর খনি গহ্বরে যাঁরা কাজ করেন, ধূ ধূ মরুতে সূর্য্যের খরতাপের সঙ্গে যাঁদের লড়াই করতে হয় (যেমন হুভার ড্যাম যাঁরা তৈরী করেছিলেন), এমন কি আমাদের দেশের দারুণ অগ্নিবাণে দগ্ধ সিপাইজীদেরও

একই অবস্থা। আমাদের দেশের জল হাওয়ার কথাই ধরা যাক, "কি বিচিত্র এই দেশ! (উত্তর ভারতের কয়েক স্থানে) দিনে প্রচণ্ড সূর্য্য এর গাঢ় নীল আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায়, (আবার পূর্বভারতে ভ্যাপসা গরমের সঙ্গে) প্রাবৃটে ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি গুরুগম্ভীর গর্জনে প্রকাণ্ড দৈত্য সৈন্যের মত এর আকাশ ছেয়ে আসে।" ভাববেন না পেশাগত ব্যাধি লিখতে বসে কাব্য চর্চা করছি, সত্যিই শুষ্ক আর আর্দ্র এই তুরকম তাপ প্রবাহে কাজ করতে হলে শ্রমিকদের মধ্যে যে ছুটি সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয় উপসর্গের বর্ণনা চিকিৎসাশাস্ত্রের বই গুলিতে দেওয়া আছে, বোধ হয় একমাত্র আমাদের দেশেই সে ছুটি যুগপৎ দেখা যায়। শুষ্ক তাপেও (কৃষক, কৃষি মজুর, পিওন ইত্যাদি পেশার লোকেরা যাকে "লু" লাগা বলে) প্রচণ্ড জ্বর এবং তার সঙ্গে মাথার যন্ত্রণা, মাথা ঘোরা বা ঝিম ঝিম করা, বেহুঁশ হয়ে যাওয়া (Heat Stroke), ভুল বকা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। আবার আর্দ্র তাপে শরীর থেকে ঘর্মাকারে অতিরিক্ত জল ও লবণ জাতীয় পদার্থ বেরিয়ে গিয়ে যে কী বিপত্তি হয়, বাঙলা দেশের লোকদের অন্তত তা বলে দিতে হবে না। এ জাতীয় তাপের ফলে যে সব উপসর্গ দেখা দেয় তাদের মধ্যে প্রধান হল পেশীতে সংকোচন বা হিট ক্র্যাম্প। অপেক্ষাকৃত তুর্বল শ্রমিক বা চাষীরাই এই যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন বেশী। পায়ের ডিম (calf) থেকে শুরু করে ক্র্যাম্প আস্তে আস্তে হাতের ও পেটের পেশীতে ছড়িয়ে পড়ে। হিট ক্র্যাম্পের পরোক্ষ কারণ আর্দ্র তাপ হলেও প্রত্যক্ষ কারণ শরীর থেকে জলীয় ও লবনাক্ত পদার্থ ঘর্মাকারে বেরিয়ে যাওয়া। তার ওপর অনেকের বদভ্যাস থাকে ঘামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তৃষ্ণা মেটাতে ঢক্ ঢক্ করে জল খাওয়া। এতে রক্ত লঘুকৃত হয়ে অর্থাৎ তরল অংশের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে সেখানে লবণের শতকরা পরিমাণ আরও কমে যায়। সঙ্গত কারণেই ঠাকুমা দিদিমারা ছেলেপিলেদের "সর্দি গর্মি"র ভয় দেখিয়ে ঘাম না শুকিয়ে জল খেতে বারণ করেন। বোঝাই যাচ্ছে এ জাতীয় বিপত্তি রোধ করবার একমাত্র উপায় ঘামের সময় নুনজল বা ইলেকট্রাল ইত্যাদি লবণ সংমিশ্রিত জল খাওয়া।

(৪) উচ্চতাপ যেমন শরীরের ক্ষতি করে অতিরিক্ত শৈত্যেও উপজীবীদের মধ্যে ফ্রস্টবাইট বা তুষার ক্ষত (Frost bite), চিলব্লেন (Chilblain) প্রভৃতি যন্ত্রণাদায়ক রোগ দেখা যায়। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন নেপোলিয়নের

মস্কো অভিযানের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ, ফরাসী সৈন্যদের মধ্যে এই সব রোগের প্রাদুর্ভাব ; ১৯৬২ সালের চীন ভারত যুদ্ধেও অনেক সৈনিক এইসব রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। কেবল সৈনিক নয়, নাবিক, ধীবর, সীমান্তরক্ষী প্রভৃতি যাঁদেরই পেশার খাতিরে হিমালয়, আলাস্কা, সাইবেরিয়া, নর্থ-সী প্রভৃতি তুষার অঞ্চলে কাজ করতে হয় তাঁরাই আক্রান্ত হতে পারেন। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় উপযুক্ত আবরণ ছাড়াই কাজ করে এসে শ্রমিকরা যদি ভুল করে আগুনে হাত পা সেঁকতে বসেন তা হলে ক্ষত আরও তীব্র হয়, হাত পায়ের আঙ্গুলের ডগায় পচন ধরাও বিচিত্র নয়।

(৫) কম্পমান যন্ত্র সংশ্লিষ্ট পেশার কুফল—১৮৬২ সালে মরিস রেনো (Maurice Raynaud) তাঁর থিসিসে এক নতুন রোগের বর্ণনা দেন, আজকাল যাকে রেনডস্ ফেনোমেনা (Raynaud's Phenomena) বলা হয়। রোগটির লক্ষণ হল হাত পায়ের বড় বড় শিরা বা ধমনীগুলিতে রক্ত চলাচল ব্যাহত না হয়েও বা অন্য কোন আপাত কারণ ছাড়াই ওই সব অঙ্গ মাঝে মাঝে পাণ্ডুর বা নীল হয়ে যায়, বিশেষ করে ঠাণ্ডায়। এর প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে লরিগা (Loriga) রোগটির সঙ্গে বায়ুচালিত কম্পমান যন্ত্রের সম্বন্ধ উল্লেখ করেন। অতঃপর অনেকেই ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে থাকেন।

কম্পমান যন্ত্র বলতে প্রধানত দুরকম, উচ্চচাপ বায়ুচালিত পিষ্টনের যন্ত্র এবং বিদ্যুৎ চালিত ঘূর্ণায়মান মোটর। প্রথম জাতীয় যন্ত্রগুলি ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের খনিতে প্রথম ব্যবহৃত হয়। এখনও কলকাতার পথে ঘাটে CMDA বা মেট্রোরেলের কৃপায় নিউম্যাটিক ড্রিল দিয়ে কংক্রিট বাঁধান রাস্তা ফাটান হচ্ছে দেখা যায়। মোটর চালিত ড্রিল বা গ্রাইণ্ডার অবশ্য গ্রাইণ্ডিং পলিশিং, ড্রিলিং প্রভৃতি বহু পেশাতেই ব্যবহৃত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, শুধু মেশিনগুলির কম্পনই নয়, শ্রমিকদের হাতে যন্ত্রগুলি যে ঝাঁকুনি লাগায়, দু'য়ে মিলিয়েই সৃষ্টি করে শারীরিক বিপত্তি। একযোগে কম্পনের পরিমাপ কমপক্ষে এক মিলিমিটার এবং সেকেণ্ডে পঞ্চাশের কাছাকাছি হওয়া দরকার; সাধারণত 250 হার্ৎস কম্পাঙ্কের যন্ত্রগুলিই এই ব্যাধি সৃষ্টি করে। এ জাতীয় ঝাঁকুনি লেগে চার রকমের আর্তি দেখা যায় : (ক) কব্জি এবং হাতের কুর্চাস্থি থেকে ক্যালসিয়াম কমে গিয়ে হাড় নরম হয়ে যায় এবং হাতে ব্যাথা হয়, যাকে শল্য চিকিৎসকরা বলেন সুডেক্স্ অ্যাট্রফি (Sudek's atrophy);

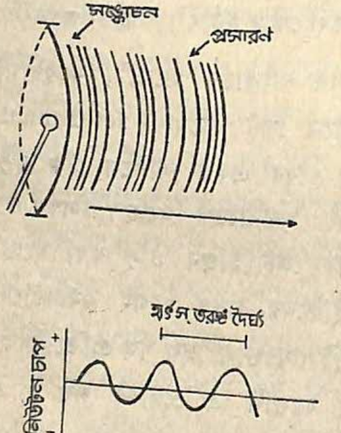
(খ) হাতের সন্ধিগুলিতে অকালে বাত ব্যাধি দেখা দিতে পারে ; (গ) হাতের পেশী জাতীয় নরম কলাগুলিতে ডুপুইট্রান্স কনট্রাক্চার (Dupuytran's Contracture), ফ্যাসাইটিস্ (Fascitis) ইত্যাদি ব্যাধি হতে পারে এবং (ঘ) রেনড্‌স ফেনোমেনা (Raynaud's Phenomenea) এবং তার ফলে আঙ্গুলের ডগায় পচন জনিত ক্ষত হতে পারে।

(৬) শব্দ দূষণের কুফল : শব্দ দূষণ বলতে আমরা সাধারণত মনে করি মাইকের, মেছো হাটার ইত্যাদি বিভৎস শব্দ। কিন্তু পদার্থবিদরা বলেন শ্রুতিগোচর শব্দ ছাড়া আরও অনেক শব্দ আছে যা মানুষ শুনতে পায় না। শব্দ তরঙ্গের দৈর্ঘ্য 15/20 থেকে 20,000 হাৎ´সের মধ্যে হলে তবেই মানুষ শুনতে পায়। 20,000 হাৎ´সের বেশী দৈর্ঘ্যের শব্দ তরঙ্গ (অতিশব্দ, Uultra Sonic) মানুষের শ্রুতিগোচর নয়, কিন্তু বাদুড়রা তা শুনতে পায় এ তথ্য বহুদিন ধরেই মানুষের জানা আছে এবং চিকিৎসকরা বিভিন্ন রোগ চিকিৎসায় বহুদিন যাবৎই আলট্রাসনিক তরঙ্গ ব্যবহার করে আসছেন, যদিও এর কুফল নিয়ে বিশেষ গবেষণা হয় নি। তবে শ্রুতিগোচর শব্দ ছাড়াও, শোনা যায় না এমন অবশব্দ (Infra Sound) যে পরিবেশ দূষিত করতে পারে সে কথা ইদানীং জানা গেছে এবং তাও জানা গেছে হঠাৎ। গল্পটা শুনুন।

কনকর্ড নামে শব্দাতিগ বিমান তখনও আকাশে ওড়েনি, কারখানায় পরীক্ষাধীন রয়েছে। দেখা গেল, যেখানে জেট্ টানেল (Jet Tunnel) পরীক্ষা হচ্ছে তার প্রায় এক কিলোমিটার দূরের একটি অফিসে ঠিক দুপুর বারটায় কর্মচারীদের মাথা ধরছে, এবং বমনোদ্রেক হচ্ছে। লক্ষ্য করা গেল ঠিক ওই সময়েই অদূরবর্তী কারখানায় জেট ইঞ্জিন চালু করা হচ্ছে ; সুতরাং মনে হওয়া স্বাভাবিক যে জেট ইঞ্জিনের প্রচণ্ড শব্দেই কর্মচারীদের এই বিপত্তি। কিন্তু তা' অসম্ভব, কারণ অফিস ঘরগুলি ছিল শব্দ প্রতিরোধক। আসল কারণ খুঁজতে গিয়ে ধরা পড়ল যে ঘরগুলি শ্রুতিগোচর শব্দ প্রতিরোধক ঠিকই কিন্তু 20 হাৎ´সের কম দৈর্ঘ্যের, কানে শোনা যায় না এমন অবশব্দ (Infrasound) ঘরে অনুপ্রবেশ করার ফলে কর্মচারীরা অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। আরও গবেষণায় জানা গেছে মোটরগাড়ী, প্লেন বা ট্রেন যাত্রীদের মাঝে মাঝে যে বমনোদ্রেক হয়, যাকে আমরা ট্রাভেল সিকনেস বলে থাকি, 20-1·5 হাৎ´স তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের এই অবশব্দই তার কারণ হতে পারে।

শ্রমিকদের ওপর অবশব্দের প্রভাব এখনও গবেষণার পর্যায়ে থাকলেও বহুক্ষণ ধরে উচ্চ গ্রামের শব্দ, বিশেষতঃ সে শব্দ অপ্রয়োজনীয় হলে, কেউই তা পছন্দ করেন না ; শব্দদূষিত পরিবেশে কার্য্যক্ষমতাও কমে যায় এবং ব্যাপারটা বেশ কিছুদিন যাবৎ চলতে থাকলে কর্মীরা বধিরতায় আক্রান্ত হতে পারেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে দেখা গেল, যে সব শ্রমিক বয়লারের মধ্যে কাজ করেন এবং যাঁদের সহকর্মীরা ঠিক সেই সময় বাইরে থেকে মেরামতের জন্য হাতুড়ী ঠুকতে থাকেন, তাঁরা প্রায়শই বধির হয়ে পড়ছেন। রোগটি এত ব্যাপক আকারে দেখা গিয়েছিল যে এর নামই রাখা হ'ল "বয়লার শ্রমিকের বধিরতা" (Boiler maker's deafness)। যে সব শ্রমিককে দিনের পর দিন তাঁতের "ঘটাং ঘটাং" শব্দের মধ্যে কাজ করতে হ'ত তাঁদের মধ্যেও ব্যাপক হারে বধিরতা দেখা দিত।

সাধারণভাবে দেখা গেছে উচ্চ পর্দার (high pitched) জোর শব্দ, বিশেষ করে সেটি যদি পশ্চাৎপটের শব্দের (background noise) চেয়ে জোর হয়, তাতে শ্রমিকরা বিরক্ত হন এবং এর ফলে তাঁরা পরস্পরের মধ্যে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলতে পারেন না, বিপদ সংকেতও সময় মত শুনতে পান না। এতে কার্য্য ক্ষমতা এবং নিরাপত্তা ব্যাহত হওটাই স্বাভাবিক। 90 ডেসিবেল এর চেয়েও উচ্চ গ্রামের শব্দে কাজ করতে হলে ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা বেড়ে যায়।



চিত্র-17 : উপরের ছবিতে বাতাপে চাপের তারতম্যে শব্দ-তরঙ্গ সৃষ্টি এবং নিচের ছবিতে তরঙ্গদৈর্ঘ্য দেখান হয়েছে।

বয়লার শ্রমিকদের বধিরতার কারণ অনুসন্ধান করে আমরা শব্দ চাপের প্রভাব জানতে পেরেছি। শিল্প সংক্রান্ত পেশায় তত না দেখা গেলেও গোলান্দাজ প্রভৃতি পেশায় (বা বোমা পটকা ইত্যাদির শব্দে) প্রচণ্ড শব্দ চাপে কানের পর্দা ফেটে যেতে পারে। শিল্পে 88 ডেসিবেল বা ততোধিক চাপে বহুক্ষণ কাজ করতে করতে শ্রবণ শারীরবৃত্ত বিকল হয়ে বধিরতা দেখা দেয়।

শব্দসূত্র (source of sound) থেকে বাতাসে পর্য্যায়ক্রমে উচ্চ ও নিম্ন-চাপ সৃষ্টি হয় এবং এই চাপের তারতম্য তরঙ্গের আকারে কর্ণপটাহে আঘাত করলে আমরা শুনতে পাই। তরঙ্গের কম্পাঙ্ককে (frequency) সাধারণত "হাৎ'স" এককে প্রকাশ করা হয়। পক্ষান্তরে বাতাসে শব্দচাপের তারতম্যকে "নিউটন" এককে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এক একক তল দিয়ে যতটা শব্দশক্তি প্রবাহিত হয় তাকে বলা হয় শব্দের তীব্রতা। শব্দের চাপ ও তীব্রতা পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল [তীব্রতা = Intensity of sound (Is) = fPs^2 ; Ps হচ্ছে শব্দ চাপ]। তীব্রতাকে সাধারণত "বেল" (Bel) একক দিয়ে প্রকাশ করা হয় (1 ডেসিবেল = 1 বেলের এক দশমাংশ) সুতরাং বেল বা ডেসিবেল একক দিয়ে শব্দের তীব্রতা ও চাপ উভয়কেই বোঝান যেতে পারে। প্রতি বর্গমিটারে 1000 হাৎ'স কম্পাঙ্কের 0.00002 নিউটন শব্দ চাপকে (অর্থাৎ শ্রুতিগোচর ফিস ফিস আওয়াজ) শূন্য ধরে শব্দের তীব্রতা ডেসি-বেল এককে গণনা শুরু হয়। সাধারণ অর্থে 70 ডেসি-বেল শব্দ 60 ডেসিবেল শব্দের দ্বিগুণ এবং 50 ডেসিবেল শব্দের 4 গুণ জোর শোনায়। নিচের তালিকায় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে শব্দের তীব্রতার হিসেব দেওয়া হল।

৭নং তালিকা : বিভিন্ন পরিস্থিতিতে শব্দের তীব্রতা

শব্দ সূত্র	ডেসিবেল	শব্দচাপ
নিম্নতম শ্রবণ সীমা	0	0·00002 নিউটন/প্রতি বর্গমিটার
রাত্রের নিস্তব্ধতা	20	0·0002 ,,
সাধারণ কথাবার্তা	60	0·002 ,,
অফিসের গোলমাল	80	0·02 ,,
জেট বিমানের অভ্যন্তর	120	20 ,,

শ্রমিকদের মধ্যে শব্দদূষণের কুফল নিবারণ করতে জনশিক্ষা, বৈমানিক গোলন্দাজ প্রভৃতি পেশায় উপযুক্ত কর্ণ আচ্ছাদন ইত্যাদির বন্দোবস্ত করা হয়ে থাকে। তা ছাড়া কর্মস্থল পরিকল্পনায় যতদূর সম্ভব শব্দ দূষণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা থাকা চাই।

রাসায়নিক শিল্পসংক্রান্ত পেশাগত ব্যাধি

(ক) ধাতু ও ধাতু যৌগের কুফল

রসায়ন চর্চা এবং জনজীবনে তার ব্যবহার মানুষ শুরু করেছিল বহুদিন আগেই ; এর ফলে প্রাচীন কালে যাঁরা ওই সব পদার্থের সংস্পর্শে আসতেন তাঁদের বহু ব্যাধিও দেখা দিত নিসন্দেহে, তবে তখন হয়ত কার্য্যকারণ সম্বন্ধটা জানা ছিল না। আমরা আগেই বলেছি রসায়ন চর্চা শুরু হয় ধাতুবিদ্যা দিয়ে। তামা, টিন, লোহা, সীসা, পারদ প্রভৃতি কয়েকটি ধাতু ব্যবহৃত হয়ে আসছে প্রাগৈতিহাসিক আমল থেকে, আবার বিভিন্ন শিল্পে ক্যাডমিয়াম (Cadmium), প্ল্যাটিনাম্, ইউরেনিয়াম্ প্রভৃতির ব্যবহার অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ধাতু সম্বন্ধে আমাদের ধারণাও বদলেছে। আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি, বিসমাথ ইত্যাদি মৌল পদার্থ হলেও ধাতু নয়, এদের উপধাতু (metaloid) বলা যায়। ফসফরাস্ প্রভৃতি মৌল আবার তাও নয়। তবু সাধারন অর্থে এগুলি ধাতু পর্য্যায়ে পড়ে বলে এদের বিষক্রিয়া এই অধ্যায়েই আলোচনা করা হ'ল।

এ যাবৎ দেখা গেছে সিসিয়াম, মলিবডেনাম, স্ট্রনসিয়াম (Strauntium) ইত্যাদি মৌলগুলির শরীরের ওপর বিশেষ কোন কুপ্রভাব নেই, আবার রূপা, নিকেল, টিন ইত্যাদি মৌল হিসাবে নিরাপদ হলেও এদের যৌগগুলি ক্ষতিকারক। এর পর আসে ধাতুর ভৌত রূপের প্রশ্ন—যেমন, সীসা বা জিঙ্ক্ অকসাইড ধূলার আকারে শরীরে প্রবেশ করলে কোন ক্ষতি হয় না অথচ তাদের ধোঁয়া মারাত্মক। তা ছাড়া ধাতুবিষটি কোন পথে শরীরে প্রবেশ করছে তার ওপরেও এদের কার্য্যকারিতা নির্ভর করে। পারদের ধোঁয়া শ্বসিত হলে শরীরের ক্ষতি হয়, অথচ চর্মরোগ বা সিফিলিসের চিকিৎসায় বিভিন্ন পারদযৌগ চামড়ায় ঘসে বা লাগিয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে বহু যুগ ধরে। আজকের দিনে এত সব ধাতু বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে যে প্রত্যেকটির বিষক্রিয়া আলাদা ভাবে বলা সম্ভব নয়, তবে কয়েকটির কার্য্য-প্রণালী বিশদভাবে আলোচ্য।

সীসা (Lead) : রঙ হিসাবে সীসার যৌগ প্রায় দু হাজার বছর ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রাচীন মিশরীয়রা তাদের পোড়ামাটির বাসনপত্র অলঙ্কৃত করতে হোয়াইট লেড্ (white lead) ব্যবহার করতেন তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। সীসা বা তার যৌগ থেকে যে শরীরের ক্ষতি হতে পারে তাও জানা গেছে বহুদিন এবং আগেকার দিনে ব্যাধিটির নাম দেওয়া হয়েছিল "শনির দশা" (Saturnism), কারণ সীসা অন্য অনেক ধাতুকে গ্রাস করার ক্ষমতা রাখে। সীসার বিষক্রিয়া দ্বিবিধ। এর অজৈব যৌগ থেকে পেট মোচড়ান, নিউরাইটিস ও রক্তাল্পতা এবং জৈব যৌগ (যথা টেট্রা ইথাইল লেড্, Tetra Ethyl Lead) থেকে অনিদ্রা ও মানসিক ব্যাধি দেখা দিতে পারে। তবে সীসা ঘটিত যে কোন রোগের নিত্য উপসর্গ—মাড়িতে নীল দাগ। ১৯৩৪ সালে সার টমাস্ লেগে লক্ষ্য করেন যে সীসার যৌগগুলি ধুলা বা ধোঁয়ার আকারে শ্বসিত হয়েই শরীরের ক্ষতি করে। কিন্তু পরে দেখা গেছে ভুক্ত হয়েও এগুলির বিষক্রিয়া দেখা দেয়। তার একটা উদাহরণ, আগেকার দিনে টুথপেস্টের টিউবগুলি তৈরী হত সীসা দিয়ে এবং মাজনের সঙ্গে ক্রমাগত পেটে যেতে যেতে একসময় পেটের গোলমাল ইত্যাদি দেখা যেত। এখন অবশ্য পেস্টের টিউব তৈরীতে সীসার ব্যবহার কমে গেছে।

পারদ (Mercury) : মারকারি নাইট্রেটের বিলম্বিত বিষক্রিয়ার কথা আগেই বলা হয়েছে। প্রাচীন ভারতের রসায়নবিদ্‌রা বা মধ্যযুগীয় অ্যালকেমিস্টরা ধাতুটি ব্যবহার করতেন বহু কাজে এবং আজও প্রায় কুড়ি তিরিশ রকম শিল্পে ধাতুটি কাজে লাগে; চিকিৎসা শাস্ত্রেও এর বহুল প্রচলন। সিঁদুর বা হিঙ্গুল (mercury sulphide)-এর ব্যবহার চীন ও ভারতে বহুদিন ধরে চলে আসছে; প্রাচীন রোমানরা এর বিষক্রিয়া সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে র‍্যামাজ্জিনি বলেন "It is from mercury mines that there issues the most cruel bane of all that deals death and destruction to miners." (খনি শ্রমিকদের মৃত্যু এবং ধ্বংসের যত কারণ আছে তার মধ্যে পারদখনি নির্গত হলাহলই সর্বাপেক্ষা নিষ্ঠুর)। মুখগহ্বরে জ্বালা, মুখে জল ওঠা, মাড়িতে ক্ষত, হাত কাঁপা, স্নায়ু দৌর্বল্য বা মস্তিষ্ক বিকৃতি এইসব উপসর্গগুলি পারদখনিতে কয়েকদিন মাত্র কাজ করলেই দেখা দিতে পারে। তবে আজকাল পারদের ব্যবহার অনেক কমে

গেছে, যেমন আয়না তৈরী করতে আর পারদ ব্যবহৃত হয় না, পুলিশরাও আঙুলের ছাপ তুলতে পারদের পরিবর্তে ক্যালসিয়াম, বিসমাথ প্রভৃতি ব্যবহার করছেন। শিল্পে পারদের জৈব যৌগের ব্যবহার শুরু হয় ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং তিন বছর পরেই লণ্ডনে এর বিষক্রিয়ায় দু'জন শ্রমিক মারা যান। জৈব যৌগগুলির মধ্যে ফেনিল মারকারি হাইড্রক্সাইড (Phenyl Mercury Hydroxide) জীবাণু, ছত্রাক বা আগাছা নাশক হিসাবে খুব জনপ্রিয়।

আর্সেনিক (Arsenic) বা সেঁকো বিষ ঃ সংশ্লিষ্ট শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সেঁকো বিষের প্রতিক্রিয়া প্রায়ই দেখা যায়। আর্সেনিকের অজৈব যৌগগুলি সাধারণত ধূলি বা ধোঁয়ার আকারে শ্বসিত হয়ে বা চর্মের সংস্পর্শে, আর্সেনিউরেটেড হাইড্রোজেন (Arsenurated Hydrogen) গ্যাসের আকারে এবং আর্সেনিকের জৈব যৌগগুলি চর্মের সংস্পর্শে শরীরের ক্ষতি করে এবং উপরিউক্ত তিন জাতীয় পদার্থের বিষক্রিয়াও ভিন্ন। অজৈব যৌগগুলি ফুসফুসের ঝিল্লি বা চর্মের প্রদাহ সৃষ্টি করে এবং তা থেকে ভবিষ্যতে ক্যান্সার দেখা দিতে পারে। হাইড্রোজেনের সঙ্গে সেঁকোবিষের যৌগটি রক্তের লোহিত কণিকা ধ্বংস করে রক্তাল্পতা বা জনডিস্ (ন্যাবা) সৃষ্টি করে, আবার জৈব যৌগ থেকে শরীরের বিভিন্ন যন্ত্রের বৈকল্য দেখা দেয়।

ক্যালসিয়াম (Calcium) ঃ চুন, অর্থাৎ ক্যালসিয়াম অক্সাইড বা হাইড্রক্সাইড্ ছাড়া এই মৌলের আর কোন যৌগ শরীরের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক নয়। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় আমরা জানি চুন লেগে হাত, পা, মুখ হেজে যায়; চোখে পড়লে চোখ জ্বালা তো করেই, নষ্ট হয়েও যেতে পারে। সুতরাং কলি মিস্ত্রীদের এ জাতীয় আর্তিতে প্রায়ই ভুগতে হয়। এ ছাড়াও অন্য অনেক পেশাতে চুন নিয়ে কাজ করতে হয়, যেমন সিমেণ্ট তৈরী করতে চক জাতিয় চুন লাগে এবং সিমেণ্ট কারখানায় যাঁরা কাজ করেন বা সিমেণ্টের বস্তা যাঁরা নাড়াচাড়া করেন তাঁদের পক্ষে শ্বাস বায়ুর সঙ্গে প্রচুর সিমেণ্টের ধূলা ফুসফুসে যাওয়া বিচিত্র নয়। এতে ফুসফুসের ক্ষতি হয়; রাজমিস্ত্রী ও মজুরদের হাত পা হেজে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ফস্‌ফরাস্‌ (Phosphorus) ঃ এই অধাতব মৌলটি তিনটি বিভিন্ন রাসায়নিক রূপে শরীরের বিভিন্ন ক্ষতি করে, যথা—(ক) দেশলাই তৈরী করতে

আগেকার দিনে যে হলদে ফস্‌ফরাস্ ব্যবহৃত হত বা কয়েক রকম আগ্নেয়াস্ত্র তৈরী করতে আজও যা হয়, (খ) ফসফরেটেড হাইড্রোজেন, যা প্লাস্টিক তৈরীর সময় শ্বসিত হয় এবং (গ) ফস্‌ফরাসের জৈব যৌগ (যথা Tri-Ortho-Cresyl-Phosphate) যা দিয়ে কীট্‌নাশক ওষুধ তৈরী হয়। ফস্‌ফরাসের বিষক্রিয়ার প্রধান লক্ষণ হ'ল এতে মাড়ি নরম হয়ে ঘা হতে পারে, এমনকি চোয়ালের হাড়েও ইনফেকশন হয়। ফসফরেটেড্ হাইড্রোজেনের বিষক্রিয়ায় পেটে ব্যথা, গা বমি, কোষ্ঠ তারল্য, এমনকি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটতে পারে।

রৌপ্য (Silver) : মানুষ এই ধাতুটি ব্যবহার করছে বহুদিন থেকেই। চার হাজার বছর প্রাচীন চালদিয়ার (Chaldia) রাজকীয় কবর থেকে রৌপ্যালঙ্কার পাওয়া গেছে। বর্তমানে ধাতুটির সর্বাধিক ব্যবহার মুদ্রা তৈরীতে। ভারতে খনিজ রূপা খুব বেশী পাওয়া যায় না, তাই ইংরাজ আমলের আগে এখানে রৌপ্য মুদ্রার বিশেষ চল ছিল না ; উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইংরাজরা "মেক্সিক্যান সিলভার" আমদানীর পর যেটুকু চালু হয়েছে। কিন্তু যে পরিমাণ রূপা ভারতে পাওয়া যেত তা দিয়েই অলঙ্কার, তৈজস্ এবং তবক শিল্প এখানে উৎকর্ষ লাভ করে। আজকাল বিভিন্ন অ্যালডিহাইড্, ভিনিগার বা মদ চোলাই এর পাত্র এবং আয়না ইত্যাদি তৈরী করতে ধাতুটি ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সিলভার নাইট্রেট্ নামে এর এক যৌগ আলোর সংস্পর্শে দ্রুত কালো হয়ে যায় বলে যৌগটি দিয়ে ফটো তোলার প্লেট বা ফিল্ম তৈরী হয় এবং যখন ডেভেলপ করবার জন্য এগুলি "হাইপো" তে ডোবান হয় তখন কিছুটা রৌপ্যযৌগ ধুয়ে যায়। ফটোর দোকানে যাঁরা ডার্করুমে কাজ করেন তাঁদের হাতের নোখে খয়েরি কালো ছোপ দেখা যায় এই রৌপ্য যৌগের জন্য। বস্তুত সমস্ত রৌপ্য সংশ্লিষ্ট পেশাতেই কর্মীদের শরীরের বিভিন্ন অংশে কালো দাগ ধরা ধাতুটির বিষক্রিয়ার প্রধান লক্ষণ ; এমন কি দাঁতও কালো হয়ে যায়। এর নাইট্রেট, ফুলমিনেট বা সায়ানাইড যৌগ ভুক্ত বা শ্বসিত হয়ে শরীরে প্রবেশ করলে বিষক্রিয়া দেখা যায়।

দস্তা (Zinc) : খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে চীনে প্রথম দস্তা তৈরী হয়। তার আগে পিতল তৈরী করতে দস্তা ব্যবহৃত হত, কিন্তু মৌল হিসাবে এর কোন পরিচয় জানা ছিলনা। আকরিক অবস্থায় জিঙ্ক সালফাইড

সাধারণত আকরিক সীসার সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। লোহা বা টিনের জং ধরা রোধ করতে এগুলির সঙ্গে জিঙ্ক মিশিয়ে নিলেই চলে, প্রক্রিয়াটির নাম "গ্যালভানাইজেশন"। তা ছাড়া একই উদ্দেশ্যে, লোহার ওপর জিঙ্ক স্প্রে করা হয়ে থাকে। পেতল ছাড়াও গান-মেটাল, জার্মান সিলভার ইত্যাদি সংকর ধাতু তৈরী করতে দস্তা লাগে। অক্সাইড্ বা সালফাইড রূপে রঙ (হ্যাভাক্স), রবার ইত্যাদি শিল্পে ধাতুটি ব্যবহৃত হয়। জিঙ্ক অক্সাইডের ধোঁয়া লেগে শ্রমিকরা কয়েকদিনের জ্বর ভোগ করেই সুস্থ হয়ে উঠেন, তার বেশী কোন ক্ষতি হয় না। জ্বরের সঙ্গে হয়ত কিছুটা গা বমির ভাব, গায়ে হাত পায় ব্যথা এবং দৌর্ব্বল্য থাকতে পারে। কিন্তু জিঙ্ক ক্লোরাইড শরীরের সমূহ ক্ষতি করে।

বেরিলিয়াম (Berellium)ঃ ধাতুটি প্রায় ইস্পাতের মত দেখতে এবং অ্যালুমিনিয়ম ও ম্যাগনেসিয়মের সমগোত্রীয়। আকরিক অবস্থাতেও এটি অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেটের সঙ্গে মিশে থাকে। প্রাকৃতিক অবস্থায় ক্রোমিয়াম অক্সাইডের সঙ্গে মিশে পান্নার আকারে অথবা সবজে নীল রঙের "অ্যাকোয়ামেরিন", জহরৎ হিসেবেও থাকতে পারে। তামা, ব্রোঞ্জ, নিকেল বা অ্যালুমিনিয়মের সঙ্গে এটি যে সব সংকর ধাতু তৈরী করে তাদের ব্যবহার বহুমুখী। পারমাণবিক শিল্পেও ধাতুটির বহুল ব্যবহার। যে শিল্পেই বেরিলিয়াম ব্যবহার করা হয় সেখানে এটির ধূলা পরিবেশ দূষিত করে, ফলে ধাতুটি শ্বসিত হ'য়ে ব্রঙ্কাইটিস্ ইত্যাদি ফুসফুসের নানা রোগ সৃষ্টি করে, যার অপর নাম বেরিলিওসিস্। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েবার ও এঙ্গেলহার্ডের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় জার্মানীতেই প্রথম এই পেশাগত ব্যাধিটি দেখা দেয়। ফুসফুসের ব্যাধি ছাড়াও ধাতুটি চর্মরোগ, কনজাংটিভাইটিস ইত্যাদি সৃষ্টি করে। বেরিলিয়াম ঘটিত বিষের প্রতিক্রিয়া কিন্তু ফুসফুসের ওপর সর্বাধিক। অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে একটা সাবধানের কথা বলে রাখা ভাল, সেটি হল এই যে আমাদের দেশে অনেক সময় টিউব লাইটের টিউবগুলি খারাপ হয়ে গেলে এগুলি বাচ্ছাদের খেলতে দেওয়া হয়। এ অভ্যাসটি রদ করা উচিত, কারণ টিউবগুলিতে সাধারণত বেরিলিয়াম আস্তরণ থাকে এবং তার থেকে শারীরিক ক্ষতির সম্ভাবনা।

ক্যাডমিয়াম (Cadmium)ঃ আকরিক অবস্থায় ক্যাডমিয়াম দস্তার সঙ্গে

মেশান থাকে এবং প্রায় দুহাজার বছর আগেও গ্রীস ও বোহেমিয়ায় এর সালফাইড যৌগ (গ্রিনোকাইট) রঙ হিসাবে ব্যবহৃত হত। আজকের দিনে ভেপর ল্যাম্প এবং ব্যাটারী তৈরী করতেও ক্যাডমিয়াম লাগে। পদার্থটি ভুক্ত হয়ে শরীরে অনুপ্রবেশ ক'রে ক্ষতি সাধন করে। লক্ষণগুলির মধ্যে মুখ দিয়ে জল ওঠা, গা বমি করা এবং পাটকিলে (brown) রঙের প্রস্রাব হওয়া প্রধান। ক্যাডমিয়ামের ধোঁয়া শ্বসিত হয়েও এই লক্ষণগুলি দেখা দিতে পারে। বিলম্বিত ক্রিয়া কিন্তু বৃক্ক ও ফুসফুসের ওপর সর্বাধিক।

ক্রোমিয়াম (Chromium) : এক সময় আমাদের দেশে ক্রোমিয়াম প্লেটিং খুব চালু হয়েছিল। ১৯২৫ সালে ফিঙ্ক্ (Fink) এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তা ছাড়া ভেষজ এবং রঙ শিল্পেও ধাতুটির যৌগ ব্যবহৃত হয়। একদিকে যেমন চর্মের সংস্পর্শে এসে এটি শ্রমিকদের চর্মরোগ বা গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে অপরদিকে তেমনি শ্বসিত হয়ে নাকের ভিতর ঘা ও ফুসফুসের ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে।

ম্যাঙ্গানিজ (Manganese) : সারা পৃথিবীর ম্যাঙ্গানিজ চাহিদার বেশ কিছুটা অংশ মেটায় ভারত ; এখানে 629 টি ম্যাঙ্গানিজ খনি আছে। সংকর ধাতু তৈরী করতে এর ব্যবহার ব্যাপক। তা ছাড়া কাচ পরিষ্কার করতে, ব্যাটারি তৈরী করতে, চীনামাটি শিল্পে, বিভিন্ন রঙে কাপড় ছাপাতেও বস্তুটি ব্যবহৃত হয়। ক্রোম্ রঙ বেশ পাকা। প্রধানত শ্বসিত হয়ে ফুসফুসের মাধ্যমে এটি দুরারোগ্য পার্কিনসনিসম ব্যাধি সৃষ্টি করে ; তা ছাড়া নিদ্রাল্পতা, পেশী সংকোচন ও ব্যথা এবং মানসিক বিকারও দেখা দিতে পারে। ভারতের গৌরওয়াধোনায় (Goari Wadhona) ম্যাঙ্গানিজ খনি শ্রমিকদের মধ্যে এবং পরে বাদির (Baadi) খনিতে কর্মরত বহু অল্প বয়স্ক শ্রমিক এই রোগে আক্রান্ত হন। লক্ষ্ণৌ এর I.T.R.C. সংস্থার ডাঃ এস. ভি. চন্দ্র শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে ম্যাঙ্গানিজের বিষক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করে দেখেছেন এতে রক্তের ক্যালসিয়াম, এবং রোগটি পুরানো হলে রক্তে Adenosine-Triphosphate বেড়ে যায়। তিনি আরও বলেন, যেসব শ্রমিক লৌহঘাটতি জনিত রক্তাল্পতায় ভোগেন, ম্যাঙ্গানিজ বিষে তাঁরাই আক্রান্ত হন বেশী এবং এর বিষক্রিয়া বংশানুক্রমিকও হতে পারে।

নিকেল (Nickel) : মৌলধাতু হিসাবে নিকেলের আবিষ্কার ১৭৫১

খ্রীষ্টাব্দে। কথিত আছে পুরাকালে হার্জ পর্বতের তাম্রখনিতে তামার যে আকর পাওয়া যেত তার থেকে বিশুদ্ধ তামা বার করা খুব শক্ত ছিল। তৎকালীন লোকেরা মনে করত এটি "নিক্" নামে অপদেবতার কারসাজি। পরে অবশ্য বোঝা গেল তামার আকরে অন্য এক ধাতুর উপস্থিতিই এর জন্য দায়ী। সুতরাং ধাতুটির নাম দেওয়া হল নিকেল। মুদ্রা প্রস্তুত অথবা ইলেকট্রোপ্লেটিংএ নিকেল প্রচুর ব্যবহৃত হয়। ইনভার, প্ল্যাটিনাইট প্রভৃতি সংকর ধাতু তৈরী করতেও নিকেল লাগে। ইলেকট্রোপ্লেটিং এ নিকেলের যে যৌগ ব্যবহৃত হয় তার সংস্পর্শে ডার্মাটাইটিস, নিকেল কার্বনিল শ্বসিত হয়ে রক্তক্ষরী ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া এবং বিশুদ্ধ নিকেলের গুঁড়া শ্বসিত হয়ে নাকের এথময়েড হাড়ে ও ফুসফুসে ক্যান্সার দিতে পারে।

কোবাল্ট (Cobalt)ঃ নিকেলের মত কোবাল্ট নামের উৎপত্তির সঙ্গেও একটা গল্প জড়িত আছে। ষোড়শ শতাব্দীর স্যাক্সনিতে স্মালটাইট থেকে রূপা তৈরী করতে গিয়ে দেখা গেল রূপার পরিবর্তে অন্য এক ধাতু পাওয়া যাচ্ছে। কোবল্ড্ বা ভূতের অপকর্ম বলে এই ধাতুটির নাম দেওয়া হল কোবাল্ট। বিভিন্ন রঙ হিসাবেই এর যৌগগুলি বেশী ব্যবহৃত হয়, ব্লু রঙের কোবাল্ট কাঁচের কথা সুবিদিত। জেট ইঞ্জিন তৈরীতেও কোবাল্ট লাগে। তা ছাড়া শল্য চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য ভাইটেলিয়াম নামে যে ধাতু সংকর দিয়ে কয়েকরকম যন্ত্রপাতি তৈরী করা হয় তার একটি উপাদান কোবাল্ট। কোবাল্ট থেকে ফুসফুসের ব্যাধি, এমনকি ক্যান্সার পর্যন্ত হতে দেখা যায়।

প্লাটিনাম (Platinum)ঃ অনেকটা রূপার মত দেখতে এই ধাতুটি আবিষ্কৃত হয় ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং স্পানিশ "প্লাটা" অর্থাৎ রূপা থেকেই ধাতুটির নাম প্ল্যাটিনাম। ধনীদের মধ্যে প্ল্যাটিনামের অলঙ্কার পরার রেওয়াজ আছে, পেট্রল ও ভেষজ শিল্পেও এর বহল প্রয়োজনীয়তা। ধাতুটির ক্ষয় নেই বলে আন্তর্জাতিক ওজন ও দৈর্ঘ্যের একক প্লাটিনাম দিয়ে তৈরী করা হয়। মৌল ধাতুটি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হলেও যৌগগুলির ধুলা বা ধোঁয়া লেগে নাক দিয়ে জল পড়া, হাঁপানি বা আমবাত দেখা যায়।

অসমিয়াম (Osmium)ঃ অসমিয়াম টেট্রক্সাইড থেকে কনজাংটিভাইটিস, মাথা ধরা ইত্যাদি রোগ হয়। জীবজন্তুর ওপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে এর থেকে ফুসফুসের ব্যাধিও হতে পারে।

সেলিনিয়াম (Selenium) : ধাতু না হলেও মৌলটির অনেক গুণাবলী ধাতুর তুল্য। পিরিয়ডিক টেবিল অনুযায়ী এটি গন্ধকের সমগোত্রীয়। পদার্থটি নিয়ে যাঁরা ঘাঁটাঘাঁটি করেন তাঁদের নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ দেখা দেয়, দাঁতে পোকা লাগে। সেলিনিয়াম অক্সিক্লোরাইড চামড়ায় লাগলে চামড়া পুড়ে যায়। উল্লেখযোগ্য, টেলিরিয়াম মৌলটিরও বিষক্রিয়া প্রায় অনুরূপ।

থেলিয়াম (Thelium) : কীট পতঙ্গ এবং ইঁদুর মারতে থেলিয়াম সালফেট ব্যবহার করা হয়। তা ছাড়াও চশমার কাচ বা অনুপ্রভ রঙ তৈরী করতে এটি কাজে লাগে। চুল তুলে ফেলার এবং ছত্রাকনাশক ওষধি হিসেবেও মৌলটি জনপ্রিয়। অল্প পরিমাণ পেটে গেলে এর বিষক্রিয়ায় সমস্ত শরীর থেকে চুল উঠে যায় এবং স্নায়ুর প্রদাহ দেখা দেয়, ফলে স্কটোমা প্রভৃতি চোখের অসুখ হয়। অধিক পরিমাণে পেটে গেলে এটি মারাত্মক বিষের কাজ করে ; হাত পা ফুলে ওঠে ; বমি, পেটে ব্যথা, নিদ্রাল্পতা ও মানসিক বিকার ঘ'টে মৃত্যু হয়। শ্বসিত হয়ে বা চর্মের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করলেও এই সব উপসর্গ অল্প বিস্তর দেখা যায়।

রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় ধাতুর কুফল তৃতীয় পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে। সিসিয়াম, সেরিয়াম, কলম্বিয়াম, গেলিয়াম, জার-মেনিয়াম, হাফনিয়াম, ইণ্ডিয়াম, ল্যানথেনাম, মলিবডেনাম, রেনিয়াম রোডিয়াম, রুবিডিয়াম, স্ট্রনসিয়াম প্রভৃতি ধাতুর বিষক্রিয়া এখনও ধরা পড়েনি।

ইংলণ্ডের ফ্যাক্টরি আইনে (১৯৬১) যে সব পেশাগত ব্যাধির খবর প্রধান ফ্যাক্টরি পরিদর্শককে (শ্রম দপ্তর) অবশ্যই জানাবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে আর্সেনিক, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম, সীসা, ম্যাঙ্গানিজ, পারদ এবং ফসফরাস (ট্রাইফেনিল ও ট্রাইক্রেসিল ফসফেট সহ) ধাতুর বিষক্রিয়া তালিকাভুক্ত হয়েছে। তা ছাড়া বিপরীত সাক্ষ্য প্রমাণ না পেলে কয়েকটি ব্যাধি পেশাগত ধরে নিয়ে শ্রমিকদের শিল্প সংক্রান্ত দুর্ঘটনার জন্য ক্ষতিপূরণ (Industrial Injuries Benefit) দেওয়া হয়। শ্রমিক স্বার্থ ও স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে শিল্পোন্নত দেশগুলি এতই তৎপর যে সরকার ও চিকিৎসক সমাজ প্রধানত চারটি উপায়ে তাঁদের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখেন। প্রথমত, শ্রমিকদের মধ্যে ধাতুঘটিত বিষক্রিয়ার উপসর্গ দেখে ; দ্বিতীয়ত, উপসর্গ প্রকাশ

পাবার আগেই বিষ শরীরের ওপর যে প্রকট ছাপ রাখে তা পর্য্যবেক্ষণ করে ; তৃতীয়ত, রসায়নাগারে পরীক্ষার দ্বারা শ্রমিকদের বিষক্রিয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করে এবং চতুর্থত, নিয়মিত ভাবে শ্রমিকদের রক্ত, প্রস্রাব, কফ্ ইত্যাদি পরীক্ষা করে। উদাহরণ স্বরূপ সীসার বিষক্রিয়ার কথাই ধরা যাক্। প্রথমত বদহজম, পেটে অস্বস্তি, গা-হাত-পায়ে ব্যথা এবং শরীর ম্যাজ্ম্যাজ্ করা ইত্যাদি উপসর্গ দেখে সন্দেহ করা হয় যে হয়ত শ্রমিকটির ওপর সীসার বিষক্রিয়া শুরু হয়েছে। দ্বিতীয়ত, লক্ষ্য করা হয় তার দেহে সীসা বিষের স্বতন্ত্র কোন কুফল (যথা কব্জি ঝুলে যাওয়া, যাকে ইংরাজিতে বলে "রিসট্ড্রপ্) দেখা যাচ্ছে কি না। তৃতীয় পর্য্যায়ে সঙ্গে সঙ্গে তার রক্তের হিমোগ্লোবিন পরীক্ষা করে দেখা হয় সেটি স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় কমেছে কি না ; এবং চতুর্থতঃ রক্তে সীসার পরিমাপ করে দেখা হয় সেটি সর্বাধিক নিরাপদ সীমা (সীসার ক্ষেত্রে 100 মিলিমিটার রক্তে 80 মাইক্রোগ্রাম) ছাড়িয়ে গেছে কি না।

কেবল শ্রমিক শরীরে বিষগুলির নিরাপদ সীমা নয়, তাদের কর্মস্থল ও বাসস্থানের পরিবেশেও (যেমন যে সব বিষাক্ত পদার্থ শ্বসিত হয়ে শরীরে অনুপ্রবেশ করে তাদের ক্ষেত্রে বাতাসে) নিরাপদ সীমার দিকে নজর রাখা হয়। এই নিরাপদ সীমা খুঁজে বার করার সময় খেয়াল রাখতে হবে শ্রমিক কতক্ষণ সেই দূষিত পরিবেশে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন।

পেশাগত ব্যাধিতে ভুগতে শুরু করলেই শ্রমিককে কার্য্যান্তরে নিয়োগ করে বা তাকে অকালে অবসর নিতে বাধ্য করে, এমন কি বিষক্রিয়ার যথাযথ চিকিৎসা করেও সমস্যার সমাধান হতে পারে না ; তাতে শিল্পকে কুশলী কর্মী হারাতে হয়, শ্রমিক সমস্যা দেখা দেয়। উচিৎ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট পদার্থগুলি যাতে শ্রমিক স্বাস্থ্যের ওপর কুপ্রভাব বিস্তার করতে না পারে তার বন্দোবস্ত করা। ক্ষতিকারক ধূলা ও ধোঁয়ার হাত থেকে শ্রমিকদের রক্ষার জন্য কর্মস্থলে উপযুক্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করা দরকার (যেমন বদ্ধ কারখানার দূষিত বাতাস বার করে দেবার জন্য এক্‌জসট্ ফ্যান লাগান) এবং বিষাক্ত গ্যাস নিয়ে যাদের কাজ করতে হয় তাঁদের গ্যাস নিরোধক মুখোশ (গ্যাস মাস্ক) পরতে বাধ্য করা উচিৎ। যে সব বিষ চর্মের সংস্পর্শে ক্ষতি করে সেগুলির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য উপযুক্ত অ্যাপ্রন, দস্তানা ইত্যাদি ব্যবহার করা

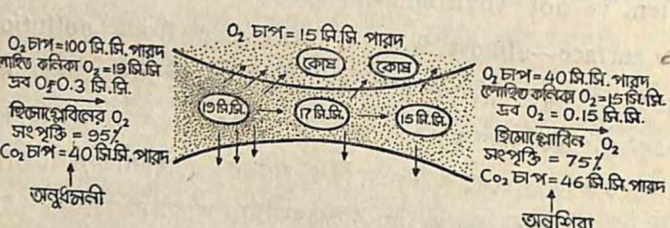
বাধ্যতামূলক হওয়া উচিৎ। কিন্তু সব চেয়ে বড় প্রয়োজন—রসায়নবিদদের বিষাক্ত পদার্থের নিরাপদ বিকল্প খুঁজে বার করার চেষ্টা।

(খ) বিষাক্ত গ্যাস সংক্রান্ত পেশাগত ব্যাধি

শিল্প বিপ্লবের ফলশ্রুতিস্বরূপ কর্মস্থলের, তথা সমগ্র শিল্পাঞ্চলের বাতাসকে কোন মতেই বিশুদ্ধ বলা যায় না, যদিও ইনডাসট্রিয়াল টক্সিকলজি রিসার্চ সেণ্টারের প্রধান ডাঃ কৃষ্ণমূর্তি বলেন "In India the major problem is not environmental degradation. Most of our land surface—almost 90%, is still free from pollution." (ভারতের মূল সমস্যা পরিবেশের অবক্ষয় নয়, এই ভূখণ্ডের শতকরা নব্বই ভাগ এখনও পরিবেশদূষণ মুক্ত)। তবে কলকাতার মত প্রায় প্রতিটি শিল্প-প্রধান শহরে জনসাধারণের অভিজ্ঞতা কিন্তু অন্যরূপ। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় পরিকল্পনার অভাবে বিষাক্ত ধূম্র-উদ্গিরণকারী কারখানা স্থাপন, স্বাস্থ্য অধিকর্তাদের অবহেলা, জনস্বাস্থ্য রক্ষার আইনকানুনের প্রতি অসাধু মালিকদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন, এই সব মিলিয়ে শহর ও শিল্পনগরীগুলির বাতাস বিষবৎ হয়ে উঠেছে। শ্রমিকদের তো কথাই নেই; কর্মজীবনের বেশীর ভাগ সময় তাঁরা এই দূষিত পরিবেশে কাটাতে বাধ্য হন। বাতাসে ক্ষতিকারক গ্যাসগুলির পরিমাণ সর্বাধিক নিরাপদ সীমা ছাড়িয়ে গেলে চারটি বিভিন্ন উপায়ে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে এবং তদনুসারে গ্যাস-গুলিকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) অক্সিজেন প্রতিস্থাপক গ্যাস (Simple asphyxiants)—বলা বাহুল্য, বেঁচে থাকার জন্য আমাদের শ্বাস বায়ুতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অক্সিজেন থাকা প্রয়োজন এবং এটি আমরা বাতাস থেকেই সংগ্রহ করে থাকি। বিশুদ্ধ বাতাসে শতকরা প্রায় 21 ভাগ অক্সিজেন এবং 79 ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। কার্বন-ডাই-অক্সাইড্ ইত্যাদি অন্যান্য গ্যাস যে থাকে না তা নয়, তবে তাদের পরিমাণ নগন্য। পরিবেশ দূষণের ফলে যদি বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ তুলনামূলক ভাবে কমে যায় তাহলে শরীরের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। শ্বাস-বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ শতকরা 12 ভাগের কম হলেই শ্বাসকষ্ট শুরু

হয়, প্রথম দিকে শ্বাস প্রশ্বাস গভীর হতে থাকে এবং অক্সিজেনের পরিমাণ শতকরা 10 ভাগের কম হ'লে "সায়ানোসিস" (নোখ, ওষ্ঠ, জিহ্বা, চোখের পাতার ঝিল্লি নীল হয়ে যাওয়া) শুরু হয় এবং শতকরা 5 ভাগের কম হয়ে গেলে রোগীর হাত-পা অবশ হয়ে আসে এবং ক্রমশ তারা জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। অবশ্য অজ্ঞান হয়ে যাওয়াটা মন্দের ভাল, কারণ এই অবস্থায় ছট্‌ফট্ করলে বা শরীরে খিঁচুনি দেখা দিলে অক্সিজেনের চাহিদা বেড়ে আরও ক্ষতির সম্ভাবনা। নাইট্রোজেন, মিথেন (মার্শ গ্যাস) এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড্ গ্যাসগুলি এই পর্যায়ে পড়ে।



চিত্র-18 : রক্তের অক্সিজেন পরিবহণের প্রণালী। তীর চিহ্ন দিয়ে অনুধমনী থেকে অনুশিরায় রক্তপ্রবাহ দেখান হয়েছে।

(খ) অক্সিজেন নিরোধী গ্যাস—এই গ্যাসগুলি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় রক্তের অক্সিজেন পরিবাহী ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। তাই এদের কেমিক্যাল অ্যাসফিক্সিয়েণ্ট বলা হয়। শারীরবিদ্‌রা বলেন সুস্থ শরীরে, বাতাসের স্বাভাবিক তাপ ও চাপে প্রতি 100 মিলি. পরিশুদ্ধ রক্তে 0·3 মিলিলিটার অক্সিজেন ভৌত দ্রব হিসাবে এবং 19 মিলিলিটার অক্সিজেন লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে রাসায়নিক যৌগ হিসাবে অবস্থান করে। বোঝাই যাচ্ছে, রক্তে অক্সিজেন পরিবহনে হিমোগ্লোবিনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কোষগুলি কতটা পরিমাণ অক্সিজেন পাবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে দ্রবীভূত অক্সিজেনের চাপের ওপর, 100 মিলিলিটার রক্তে 0·3 মিলিলিটার অক্সিজেন থাকলে গ্যাসীয় চাপ হয় 100 মিমি. পারদ। অথচ কোষ কলাতে অক্সিজেনের চাপ সাধারণত 35 মিমি. পারদ। চাপের এই তারতম্যের ফলে

চিত্র-18 তে (১) সি.সি. পারদের পরিবর্তে মি.মি. পারদ হবে। (২) কোষকলায় অক্সিজেনের চাপ 35 মি.মি. পারদ হবে।

অক্সিজেন গ্যাস দ্রুত উচ্চচাপ থেকে নিম্নচাপ অভিমুখে ধাবিত হয়, ফলে রক্তে দ্রবীভূত অক্সিজেনের চাপ কমে প্রায় 40 মিমি পারদে দাঁড়ায় এবং এমতাবস্থায় হিমোগ্লোবিন ও অক্সিজেনের যৌগ বন্ধনচ্যুত হয়ে সেখানকার শতকরা 30 ভাগ অক্সিজেন রক্তরসে বেরিয়ে আসে; সুতরাং হিমোগ্লোবিনকে প্রকৃতপক্ষে অক্সিজেনের ভাণ্ডার বলা যায়।

এখন কোষ কলাগুলি কতটা অক্সিজেন গ্রহণ করবে সেটা নির্ভর করে সেখানকার সাইটোক্রোম (Cytochrome) এনজাইমের ওপর। এটি একটি লৌহঘটিত যৌগ এবং এই লৌহ অংশটিই কোষে অক্সিজেন পরিবহনের কাজ করে থাকে। প্রসঙ্গত, হিমোগ্লোবিনেরও লৌহ অংশই অক্সিজেনের প্রকৃত ভাণ্ডার। কার্বন মনোক্সাইড প্রভৃতি গ্যাস তিনটি বিভিন্ন উপায়ে রক্তের অক্সিজেন পরিবাহী ক্ষমতা কমিয়ে দেয় (১) অক্সিজেনের পরিবর্তে কোষের সাইটোক্রোমের সঙ্গে যৌগ উৎপন্ন করে (২) হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনের চেয়েও কার্বন মনোক্সাইডকে বেশী আকৃষ্ট করে এবং (৩) কার্বন-মনোক্সাইডের উপস্থিতিতে হিমোগ্লোবিন ভাণ্ডার থেকে অনেক কম অক্সিজেন পাওয়া যায়।

(গ) ঝিল্লি প্রদাহী গ্যাস—বর্ণ বা উগ্র গন্ধের জন্য যতটা না হোক, এগুলি নাক মুখ ও শ্বাসনালীর প্রদাহ সৃষ্টি করে বলে শ্রমিকরা এদের থেকে দূরে সরে থাকতে চায়; সুতরাং এদের জন্য ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা কম।

(ঘ) বিষাক্ত গ্যাস

গ্যাসীয় পদার্থের ক্ষতিকারক ক্ষমতা কেবল তাদের রাসায়নিক প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে না, এগুলি কতটা ক্ষতি করবে অথবা আদৌ কোন ক্ষতি করবে কি না সেটা বহুলাংশে নির্ভর করে গ্যাসগুলির ভৌত গুণাবলীর ওপর। যেমন, এই মাত্র বলা হল বর্ণ ও গন্ধ বিশিষ্ট গ্যাসের উপস্থিতি সহজেই বোঝা যায়, সুতরাং এদের দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা কম; আবার কার্বন মনোকসাইড বা আর্সেনিউরেটেড হাইড্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসের উপস্থিতি বোঝাই যায় না, তাই এরা শ্রমিকদের ক্ষতি করে বেশী। আবার অ্যামোনিয়ার মত উদ্বায়ী গ্যাসগুলি স্বতই বাতাসে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। এদের আপেক্ষিক গুরুত্বের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ; উদাহরণ স্বরূপ দেখা যায়, খনির মধ্যে মিথেন গ্যাসের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে কর্মীরা অচৈতন্য হয়ে মাটিতে পড়ে

যায়, কিন্তু এতদ্বারা তাদের প্রাণও রক্ষা পায়, কারণ মিথেন বাতাসের চেয়ে হাল্কা সুতরাং এটি বাতাসের উপরের স্তর মাত্র দূষিত করে, ভূমি সংলগ্ন বাতাস মোটামুটি অবিমিশ্রই থাকে। অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন ক্লোরাইড, কার্বন মনোকসাইড্, হাইড্রোজেন সালফাইড্ প্রভৃতি অকসিজেন নিরোধী গ্যাস বাতাসের চেয়ে হাল্কা, পক্ষান্তরে নাইট্রোজেন ডাই-অকসাইড্, ক্লোরিন, ফসজেন, সালফার ডাই অকসাইড্, সালফিউরেটেড্ হাইড্রোজেন, কার্বন টেট্রা-ক্লোরাইড, এথিলিন প্রভৃতি বিষাক্ত গ্যাসগুলি বাতাসের চেয়ে ভারি।

কর্মের পরিবেশের ওপরেও গ্যাসের বিষক্রিয়া নির্ভর করে। আমরা জানি, জলাভূমিতে মিথেন গ্যাস তৈরী হ'য়ে আলেয়ার সৃষ্টি করে, কিন্তু গ্যাসটির প্রভাবে চাষীভাইদের কোন ক্ষতি হয়েছে বলে বড় একটা শোনা যায় না। কিন্তু রাস্তার ম্যানহোল বা খনিঅভ্যন্তরের বদ্ধ বাতাসে গ্যাসটির উপস্থিতি যে বহু শ্রমিকের পক্ষে মারাত্মক হয়ে ওঠে তা আমরা প্রায়ই শুনতে পাই। কারণটা বুঝতে অবশ্য কোনই অসুবিধা নেই, খোলা যায়গায় বাতাস চলাচলের জন্য ক্ষতিকারক গ্যাসের পরিমাণ তাড়াতাড়ি কমে যায়, বদ্ধ স্থানে সে সম্ভাবনা নেই। সুতরাং খনি, ট্যাঙ্ক, পিট, ভ্যাট্, বয়লার, পাতকুয়া, টানেল, জাহাজের খোল ইত্যাদি বদ্ধ স্থানে কাজ করতে নামার আগে বেশীমাত্রায় সাবধানতার প্রয়োজন। ট্যাঙ্ক ইত্যাদি নিয়মিত সাফ্‌সুত্‌রো রাখলেও নিস্তার নেই, কারণ গ্যাসগুলি এদের আস্তরণে শোষিত অবস্থায় থাকতে পারে এবং প্রবেশদ্বার খুললেই বাতাসের স্বাভাবিক চাপে এগুলি বেরিয়ে পড়ে। এসব স্থানে কাজ করতে হলে কয়েকটি সাধারণ নিয়ম মেনে চলা উচিৎ। প্রথমত বিভিন্ন উপায়ে এদের উপস্থিতি আগে থেকে অনুমান করতে হবে, দলবদ্ধ ভাবে কাজ করতে হবে, প্রয়োজন হলে গ্যাস মুখোশ ব্যবহার করা দরকার। তা ছাড়া শ্রমিকদের এই সব গ্যাসীয় বিষের লক্ষণ ও তার প্রতিরোধ সম্বন্ধে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার এবং আবশ্যিক ভাবে কর্মস্থলের কাছাকাছি বিশুদ্ধ অক্সিজেনের ব্যবস্থা সহ প্রাথমিক শুশ্রূষাকেন্দ্র থাকা উচিৎ। আমাদের দেশে ফ্যাক্টরি আইনে এ সব আদেশ লিপিবদ্ধও আছে। কিন্তু মানে ক'জন?

নাইট্রোজেন (Nitrogen, ব্ল্যাক ড্যাম্প বা চোক্ ড্যাম্প)—বহু শতাব্দী ধরেই মানুষ লক্ষ্য করে আসছে খনি, পাতকুয়া ইত্যাদি বদ্ধ স্থানে কাজ করতে

নামলে শ্রমিকদের অনেক সময় শ্বাসকষ্ট দেখা দেয় এবং তারা অজ্ঞানও হয়ে যেতে পারে; দু একটি ক্ষেত্রে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে দেখা গেছে। চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেরা (মধ্যযুগীয়?) একে অপদেবতার কারসাজি মনে করত। পরে ধারণা জন্মাল যে এর জন্য দায়ী কার্বণ ডাই অক্সাইড গ্যাস। কিন্তু ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে হলডেন ও অ্যাট্‌কিনসন প্রমাণ করলেন কার্বন ডাই অক্সাইড নয়, এই অঘটনের জন্য দায়ী নাইট্রোজেন। অ্যামোনিয়া প্ল্যাণ্টে, ইলেকট্রিক বাল্‌ব তৈরীতে এবং এই রকম আরও কিছু শিল্পে নাইট্রোজেন ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বদ্ধ স্থানে বিপদটা অন্য রকম। সেখানে বাতাসের অক্সিজেন কমে নাইট্রোজেনের পরিমান আপেক্ষিক ভাবে বেড়ে যায়। যেমন, আকরিক কয়লার ভেজাল—পাইরাইট (FeS_2) এবং ক্যাল্‌সাইট ($CaCo_3$) নিজেদের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় বাতাস থেকে প্রচুর অক্সিজেন খরচ করে ফেলে এবং পরিবর্তে কিছু কার্বন ডাই অক্সাইড ফিরিয়ে দেয় ($4Fe\ S_2 + 150_2 + 8\ CaCo_3 = 8\ Co_2 + 8CaSo_4 + 2F_20_3$)। আরও ভয়ের ব্যাপার এই যে. পাতকুয়ার ইট পাথরের খাঁজে বা খনির কোল ফেস্‌ (Coal face)-এ নাইট্রোজেন গ্যাস শোষিত অবস্থায় থেকে যায় এবং বাতাসের চাপ কমে গেলে (যেমন ঝড় বৃষ্টিতে যায়) নাইট্রোজেন বেরিয়ে আসে। নাইট্রোজেন গ্যাস গন্ধ ও বর্ণহীন বলে এর উপস্থিতি এমনিতে বোঝা যায় না (বাতাসে যে শতকরা প্রায় 79 ভাগ নাইট্রোজেন আছে আমরা কোন দিনই তা উপলব্ধি করি না) এর উপস্থিতি জানতে গেলে বদ্ধ স্থানে একটা জ্বলন্ত মোমবাতি নামিয়ে দেখতে হয়। নাইট্রোজেনের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশী হ'লে (প্রকারান্তরে অক্সিজেনের পরিমাণ কম হলে) বাতিটির ঔজ্জ্বল্য কমে আসে এবং নাইট্রোজেনের পরিমাণ 15·8 শতাংশ বেশী হ'লে বাতিটি সম্পূর্ণ নিভে যায়।

মিথেন (Methane, মার্শ গ্যাস, ফায়ার ড্যাম্প)—বর্ণ ও গন্ধহীন এই গ্যাসটি গাছপালা ইত্যাদি জৈব পদার্থ বিযোজিত হয়ে তৈরী হয়। সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই কয়লা খনিগুলিতে এই গ্যাসের দৌরাত্ম্যে বহু খনি শ্রমিক প্রাণ হারাতে শুরু করেছেন, কারণ ওই সময় থেকেই খনিগুলি গভীরতর ভাবে খনন করা হচ্ছে। আসলে মাটির তলায় কোল ফেসে গ্যাসটি বন্দী অবস্থায় থাকে এবং যত গভীরে থাকে সেখানকার চাপ তত বেশী বলে পরিমাণটাও

বেশী। খোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে খনি অভ্যন্তরের চাপ কমে বায়ুমণ্ডলের চাপের সমান হয়ে যায় আর গ্যাসটিও মুক্ত অবস্থায় বেরিয়ে আসে। এমনিতে এটি শরীরের পক্ষে বিষাক্ত নয়, কিন্তু সর্বোচ্চ নিরাপদ সীমা ছাড়িয়ে গেলে বাতাসে প্রয়োজনীয় পরিমাণ অক্সিজেনের অভাব ঘটে। তাছাড়া দাহ্য গ্যাস বলে শ্রমিকরা উন্মুক্ত আগুন নিয়ে খনিতে প্রবেশ করলে বিস্ফোরণ ঘটে অনেক শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছেন। ১৮১৬ খ্রীঃ সার হামফ্রে ডেভি মাইনারস সেফটি ল্যামপ আবিষ্কার করায় খনি অভ্যন্তরে মিথেন গ্যাস জনিত বিস্ফোরণের সংখ্যা বহুলাংশে কমে গেছে।

কার্বন ডাই অক্সাইড (carbon-dioxide)—গ্যাসটি বর্ণ ও গন্ধহীন এবং বাতাসের চেয়ে ভারি। ভাঁটিখানায় বা চুনাপাথরের খনিতে অথবা কোক্ (কাঁচা কয়লা) পোড়ালে প্রচুর পরিমান CO_2 গ্যাস তৈরী হয়। তা ছাড়া সোডা জাতীয় পানীয় তৈরী করতে, ঠাণ্ডায় খাদ্যাদি সংরক্ষণ করতে, আগুন নেভাবার যন্ত্রে এই গ্যাস ব্যবহৃত হয়। ডাক্তারী করতেও অনেক কাজে CO_2 গ্যাস লাগে। সুতরাং এই সব পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের CO_2 জনিত ক্ষতি হতে পারে। শ্বাসবায়ুতে শতকরা মাত্র 5 ভাগ CO_2 থাকলেই মস্তিষ্কের শ্বাসপ্রশ্বাস কেন্দ্র উত্তেজিত হয়ে শ্বাস ক্রিয়া দ্রুত ও গভীরতর হয়ে যায়। এবং যদি পরিমাণ শতকরা 30 ভাগের বেশী হয়, শ্বাস প্রশ্বাস কেন্দ্র কার্য্যকারিতা হারিয়ে ফেলে।

কার্বন মনোক্সাইড (Carbon Monoxide)—যতরকমের গ্যাস থেকে মানুষের ক্ষতি হতে পারে তার মধ্যে কার্বন মনোক্সাইডই বোধ হয় সর্বপ্রধান। ১৯৬৩ সালে ইংলণ্ড ও ওয়েলসে এই গ্যাসের বিষক্রিয়ার কবলে পড়েছিলেন 3330 ব্যক্তি। আরও চিন্তার বিষয়, গৃহবধূর মত এত নির্ঝঞ্ঝাট পেশাতেও (যদি গৃহিনীর কাজকে আপনারা পেশা বলতে রাজি থাকেন!) অনেকে গ্যাসটির বিষক্রিয়ার বলি হয়েছেন, কারণ রান্নার গ্যাস হিসাবে কোল গ্যাসের (বা ওয়াটার গ্যাস) ব্যবহার। আজকাল অবশ্য ঘরে ঘরে সিলিনডার গ্যাস (বিঠটেন) ব্যবহার হয় কিন্তু কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত কলকাতায় ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানী রান্নার জন্য কোল গ্যাস সরবরাহ করতেন। আমাদের দেশে তখন বেশীর ভাগ বাড়িতেই ঘুঁটে-কয়লার উনুন বা কেরসিন ষ্টোভে রান্না হত, কিন্তু বিলাতে শুধু রান্নাই নয়, শীতকালে গ্যাস ষ্টোভ জালিয়ে

ঘর গরম করার রীতিও প্রচলিত ছিল। সুতরাং ওদেশে কার্বন মনোক্সাইড বিষের ফলে শারীরিক ক্ষয়ক্ষতির সংখ্যা ছিল খুব বেশী।

দেখা গেছে কয়লা অসম্পূর্ণভাবে দগ্ধ হলেই কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। বাতাসে গ্যাসটির সর্বোচ্চ নিরাপদ সীমা হিসাব করা হয়েছে শতকরা 0·1 ভাগ। কয়লার ধোঁয়ায় (smoke) এর উপস্থিতি শতকরা 5 ভাগ, রান্নার গ্যাসে (coal gas) শতকরা 5·17 ভাগ এবং ব্লাস্ট ফার্নেসের ধোঁয়ায় শতকরা 30 ভাগ। গ্যাস ইঞ্জিন ও বয়লার তৈরীর কাজেও গ্যাসটি ব্যবহৃত হয়। তা' ছাড়া পেট্রোল ও ডিজেল ইঞ্জিন থেকে যে ধোঁয়া বের হয় তাতেও ক্ষতিকারক পরিমাণে গ্যাসটি মিশে থাকে; বিশেষ করে গাড়ীর ইঞ্জিন যদি এমন ভাবে টিউন করা থাকে যাতে কার্বুরেটরে বাতাসের চেয়ে পেট্রোলের পরিমাণ বেশী হয় তাহলে এক্‌জসট ধোঁয়ায় (exhaust fume) প্রচুর পরিমাণ কার্বন মনোক্সাইড থাকতে পারে। সুতরাং মিস্ত্রীরা যখন নতুন ইঞ্জিন বেঁধে সেটা চালু করে "তেল খাওয়ান" তখন তাঁদের সাবধানে কাজ করা উচিৎ। তা ছাড়া বাড়ি ঘরে আগুন লাগলে যখন অল্প স্বল্প ধোঁয়া বেরতে থাকে বা যখন আগুন প্রায় নিভে এসে ধিক্ ধিক্ করে জ্বলতে থাকে, তখন গ্যাসটি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতে পারে এবং দমকল শ্রমিকদেরও এই বুঝে সাবধান হওয়া ভাল। কয়লার খনিতে মিথেন গ্যাসে আগুন লেগেও কার্বন মনোক্সাইড তৈরী হয় বলে খনি শ্রমিকদের মধ্যে এটি "after damp" নামেই বেশী পরিচিত।

গ্যাসটির বিষক্রিয়া সম্বন্ধে আগেই বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধহীন বলে গ্যাসটির উপস্থিতি টের পাওয়া খুব শক্ত। তা ছাড়া বাতি জেলে পরীক্ষা করেও এর হদিস্ মেলে না। হলডেন্ সাহেব খনি অভ্যন্তরে এই গ্যাসের উপস্থিতি নির্ণয় করতে এক অভিনব পদ্ধতি চালু করেছিলেন। সন্দেহ হলে খনির মধ্যে একটি সুস্থ ইঁদুরকে (ক্যানারী পাখি হলে আরও ভাল হয়) নামিয়ে তার ওপর কার্বন মনোক্সাইডের কোন বিরূপ ক্রিয়া হয় কিনা দেখে নেওয়ার কথা তিনি সুপারিশ করেছেন। বিষ-ক্রিয়ার আদি পর্বে মাথা ঝিমঝিম করা, শ্বাস বন্ধ হয়ে আসা, হাত-পা অবশ হয়ে পড়া ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়, পরে শ্রমিকটি জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। রক্তে কার্বন মনোক্সাইডের উপস্থিতি নির্ভুল ভাবে পরিমাপের জন্য আজকাল

spectroscopy ব্যবহৃত হচ্ছে। এই প্রসঙ্গ শেষ করার আগে আর একটা কথা বলা দরকার; কার্বন মনোক্সাইডের হাত থেকে বাঁচার জন্য যে গ্যাস মুখোস্ ব্যবহার করা হয় তাতে কপার, কোবাল্ট ও সিলভার অক্সাইড থাকা উচিৎ।

সালফ্যুরেটেড হাইড্রোজেন (H_2S) ও সায়ানাইড (CN) গ্যাস—কার্বন মনোক্সাইডের মত এই দুটি গ্যাসও রক্তের অক্সিজেন পরিবহণ ক্ষমতা কমিয়ে শরীরের ক্ষতি করে। এদের মধ্যে প্রথমোক্ত গ্যাসটি দুর্গন্ধযুক্ত, যার থেকে খনি শ্রমিকদের মধ্যে স্টিঙ্ক ড্যাম্প (stink damp) নামটি চালু হয়েছে এবং এটি বাতাসের চেয়ে ভারি। শতকরা 0·02 ভাগে বাতাসে উপস্থিত থাকলেই ক্ষতির সম্ভাবনা এবং শতকরা 0·1 ভাগ হলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। গ্যাসটির সর্বোচ্চ নিরাপদ সীমা ধরা হয়েছে শতকরা 0·002 ভাগ। এটি লোহিত কণিকার মেথিমোগ্লোবিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রক্তের অক্সিজেন পরিবহন ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

খবরের কাগজে মাঝে মধ্যে পটাশিয়াম সায়ানাইড (Potassium Cyanide) বা হাইড্রোসায়ানিক এসিড (Hydrocyanic acid) প্রয়োগে আত্মহত্যা বা খুনের কথা শোনা যায়। এই সূত্রে একটি মজার গল্পও প্রচলিত আছে, রাশপুটিন মদের সঙ্গে পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে রাশিয়ার জেরিনাকে নাকি অভিভূত করে দিয়েছিলেন। বস্তুত ইথাইল অ্যালকোহলের সংস্পর্শে সায়ানাইডের বিষক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায়। যাই হোক, আর কোন বিষই বোধ হয় সায়ানাইডের মত এত দ্রুত ক্ষতি করে না। বাতাসে সায়ানাইড গ্যাসের সর্বোচ্চ নিরাপদ সীমা শতকরা 0·001 ভাগ। ফটোগ্রাফিতে, ইলেকট্রোপ্লেটিং করতে বা আকর থেকে বিশুদ্ধ সোনা আহরণ করতে এটি ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে একসময় গুদাম ঘরে ইঁদুর মারবার জন্য এই গ্যাস স্প্রে করা হত। কাগজি বাদামের গন্ধ বিশিষ্ট এই গ্যাসটি কোষের সাইটোক্রোম এনজাইম নষ্ট করে শরীরের ক্ষতি করে, তাই আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে না। গল্পের ট্যানটেলাস্, রাজার মত প্রচুর অক্সিজেনের মধ্যে থেকেও কোষগুলি অক্সিজেন ব্যবহার করতে পারে না। যাঁরা বিষটি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন তাঁদের হাতে দুরারোগ্য ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে। যদি সুযোগ পাওয়া যায় তবে অ্যামিল নাইট্রেট শুঁকিয়ে বা সোডিয়াম

নাইট্রেট ইনজেকশন দিয়ে সায়ানাইড বিষে আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা করা যেতে পারে।

ফসফাইন, আর্সাইন প্রভৃতি কয়েকটি ঝিল্লি প্রদাহী গ্যাসের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তা ছাড়াও সালফার ডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়া, নাইট্রাস গ্যাস (NO_2), হ্যালোজেন শ্রেণীর মৌল (অর্থাৎ ক্লোরিন, ফ্লোরিন ইত্যাদি) কিংবা ফস্‌জেন ইত্যাদি যৌগগুলিও এই পর্যায়ে পড়ে। দেখা গেছে ঝিল্লি প্রদাহী এই সব গ্যাসের ক্ষতিকারক ক্ষমতা বহুলাংশে নির্ভর করে এদের জলে দ্রব্যতার ওপর। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় অ্যামোনিয়া নামক উদ্বায়ী গ্যাসটির দ্রবনীয়তা খুব বেশী, সুতরাং ফুসফুস পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই শ্বাসনালীর ঝিল্লি গ্যাসটি শোষণ করে নেয় আবার ক্লোরিনের মত যে সব গ্যাস খুব বেশী পরিমাণে জলে মেশে না সেগুলি ফুসফুসের গভীরে প্রবেশ করে সেখানকার ক্ষতি করে।

অ্যামোনিয়া (Ammonia)—আমাদের দেশে ক্রমবর্ধমান সার শিল্প বা রেফ্রিজারেটর কারখানার দৌলতে অ্যামোনিয়ার ব্যবহার খুব বেড়ে গেছে। যদিও উন্নত মানের রেফ্রিজারেটরগুলিতে আজকাল ঠাণ্ডা করার জন্য ফ্রিয়ন গ্যাস (ডাইক্লোরো—ডাইফ্লুরো মিথেন) ব্যবহৃত হচ্ছে তবু বেশ কিছু যন্ত্রের সিলড ইউনিটে অ্যামোনিয়া গ্যাস ব্যবহার করা হয়। ঝাঁঝাল এই গ্যাসটি চোখের ও চামড়ার প্রচণ্ড ক্ষতি করে।

ক্লোরিন (Chlrorine)—১৭৮৫ সালে বার্থোলেট্ ব্লিচিং পাউডার আবিষ্কারের পর থেকে কাগজের কল, ময়দা কল, রঙ কারখানা ইত্যাদি বহু শিল্পে বস্তুটির ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। কিন্তু জনসাধারণের কাছে ব্লিচিং পাউডারের সবচেয়ে বড় পরিচয় এটি পানীয় জল এবং নালা-নর্দমা ইত্যাদি জীবাণু মুক্ত করে এবং পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলির দৌলতে বস্তুটির প্রধান উপাদান ক্লোরিন গ্যাসের সঙ্গে আমরা অল্পবিস্তর সবাই পরিচিত। গ্যাসটির উগ্র গন্ধ ভুল করার নয়। এক সময় মনে করা হত ক্লোরিন গ্যাস শরীরের জলীয় অংশের সঙ্গে হাইড্রোক্লোরিক এসিড তৈরী করে কোষের ক্ষতি করে ; কিন্তু পরে জানা গেছে গ্যাসীয় অবস্থায় ক্লোরিন হাইড্রোক্লোরিক এসিডের চেয়ে অন্তত বিশগুণ ক্ষতিকারক। গ্যাসটি নাকে গেলে প্রথমেই দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়, তারপর আক্রান্ত ব্যক্তি কাশতে শুরু করে, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় নাক, মুখ, চোখে

জ্বালা। আগেই বলা হয়েছে জলে খুব বেশী দ্রবনীয় নয় বলে এটি ফুসফুসের সমূহ ক্ষতি করে। ফস্‌জেন নামে ক্লোরিন গ্যাসের আর একটি যৌগের বিষক্রিয়াও সুবিদিত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাসায়নিক বিধ্বংসী হিসাবে এটি প্রচলিত হয়।

ক্লোরিন—১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্লোরিন আবিষ্কারের কৃতিত্ব হেনরী মইসাঁ (Henry Miesan) নামে এক ফরাসী বিজ্ঞানীর। এই গ্যাস এবং এর যৌগগুলি (HF, H_2SiF_6, SiF_4 ইত্যাদি) বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত হয়। আবার ক্রায়লাইট, সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং বেরিয়াম ফ্লুওসিলিকেট ব্যবহার হয় কীটনাশক হিসাবে। গ্যাসটির প্রভাবে চর্ম ও শ্বাসনালী ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা এবং পদার্থটি হাড়ে জমা হয়ে থাকে বলে দাঁত ও হাড়ের ক্ষতি করে। এটি স্তনদুগ্ধের মাধ্যমে মায়ের শরীর থেকে শিশুর দেহে সঞ্চারিত হয়, তাই তাদেরও নিস্তার নেই।

(গ) সংশ্লেষিত রাসায়নিক শিল্পে পেশাগত ব্যাধি

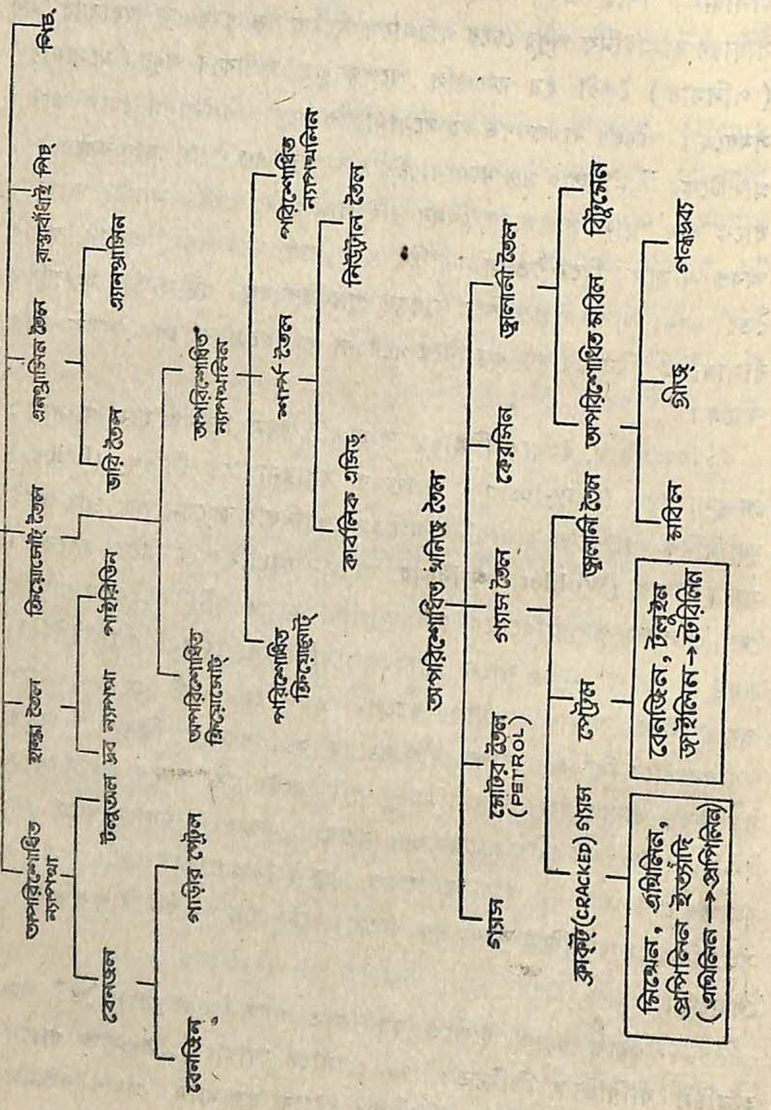
সেই আদিম কাল থেকেই মানুষ তার নিত্য ব্যবহার্য বস্তুগুলির জন্য প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু বিগত সার্দ্ধশত বছরে রসায়ন শাস্ত্রের অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে এখন বহু জিনিষই কৃত্রিম উপায়ে সংশ্লেষিত রাসায়নিক দিয়ে তৈরী হচ্ছে, ফলে ধাতু, তুলা, রঙ ইত্যাদি প্রাকৃতিক বস্তুগুলির চাহিদাও কমে আসছে। ১৮৬২ সালে লণ্ডনের "গ্রেট্ ইনটার-ন্যাশানাল প্রদর্শনী (Great International Exhibition)-তে আলাকজাণ্ডার পার্কস্ নামে এক অজ্ঞাত পরিচয় রসায়নবিদ্ কিছু বিচিত্র দর্শন বস্তু প্রদর্শন করে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে পড়েন। বস্তুগুলির উপাদান হিসাবে এমন এক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়েছিল যা গরম করলে নরম হয়ে যায় এবং সেই অবস্থায় সেটিকে যথেচ্ছ রূপ দেওয়া সম্ভব; আবার ঠাণ্ডা হলে পদার্থটি ধাতুর মত শক্ত হয়ে যায়, যার জন্য এই জাতীয় বস্তুকে বলা হয় "প্লাসটিক"। চাহিদা বুঝে পার্কস রাসায়নিকটির পেটেণ্ট নিলেন এবং তৈরী করার এক ছোটখাট কারখানাও খুলে ফেললেন, যদিও কারখানাটির আয়ু ছিল মাত্র দু' বছর। তবু সেলুলোজ নাইট্রেট এবং ক্যাস্টর অয়েলের সংমিশ্রণে

তৈরী এই আদিমতম প্লাসটিক (পার্কস যার নাম রেখেছিলেন জাইলোনাইট) রাসায়নিক শিল্পে এক নব যুগের সূচনা করেছিল। প্লাসটিকের অণুগুলি সাধারণ রাসায়নিক অণুর চেয়ে পরিমাপে অনেক বড় এবং এই বৃহদাকার অণু (পলিমার) তৈরী হয় কতগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার অণুর (মনোমার) সমন্বয়ে। এদের নামকরণও হয় মনোমারটির সঙ্গে পলি উপসর্গ যোগ করে। প্লাসটিকের নমনীয়তার জন্য মনোমারটির সঙ্গে অন্য এক পদার্থ যোগ করতে হয়, যাকে বলে "প্লাসটিসাইজার", যেমন জাইলোনাইটের ক্ষেত্রে ক্যাস্টর অয়েল। অবশ্য আজকের দিনে তৈজস পত্রাদি থেকে শুরু করে পলি এস্টার সূতার তৈরী জামা কাপড় পর্যন্ত শিল্পে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক বস্তুর এই জাতীয় সংশ্লেষিত রাসায়নিক বিকল্পের মত বস্তু নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছিল বেশ কয়েক বছর আগে।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দ, ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের দাপট তখন স্তিমিত হয়ে আসছে; গে-লুসাকের (Gay-lussac) ব্যক্তিগত রসায়নাগারে লিবিগ্ (Leibeg) ফুলমিনিক এ্যাসিডের রাসায়নিক সংকেত আবিষ্কার করলেন এবং প্রায় একই সময়ে উলার (Wohler) আবিষ্কার করলেন সায়ানিক এ্যাসিডের সংকেত। দেখা গেল জড় পদার্থ হিসেবে দুটি আলাদা হলেও দুটিই একইরকম মৌলের সমষ্টি। এর পর ১৮২৮ সালে উলার অ্যামোনিয়াম সায়ানেট থেকে ইউরিয়া প্রস্তুত করে আবার প্রমাণ করলেন একই মৌলসমষ্টি হেরফের করে রসায়নাগারে বিভিন্ন গুণসম্পন্ন যৌগ সংশ্লেষ করা সম্ভব। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, প্রমাণ হল অ্যামোনিয়াম সায়ানেটের মত অজৈব পদার্থ থেকে ইউরিয়ার মত জৈব যৌগ সংশ্লেষ করা সম্ভব। এর ফলে রসায়ন শাস্ত্রে এক যুগান্তর তো এলোই, জীবন-রহস্যেরও কিছু ইংগিত পাওয়া গেল। এর পর সংশ্লেষিত রসায়ন শিল্পে আর এক বিপ্লব ঘটে গেল ওই উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে।

১৮১২ খৃষ্টাব্দ থেকেই ইংলণ্ডে কয়লাজাত গ্যাস (coal gas) তৈরী শুরু হয়েছিল বাণিজ্যিক ভিত্তিতে। ১৮২৫ সালে ফ্যারাডে তৈলজাত গ্যাসে বেনজিনের সন্ধান পেয়েছিলেন; ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে হফ্ম্যান প্রমাণ করলেন কয়লাজাত আলকাতরাতেও বেনজিন আছে। কিন্তু সংশ্লেষিত রসায়ন শিল্পের হোতা বলা যায় উইলিয়াম হেনরী পারকিনকে। কৃত্রিম কুইনিন

তৈরী করব বলে আরম্ভ করে তিনি রসায়নাগারে তৈরী করে বসলেন এক সংশ্লেষিত রঙ-মভেইন বা লাল অ্যানিলিন (১৮৫৬ খৃঃ)। বাজারে তখন বস্তুটির



চাহিদা খুব, সুতরাং অচিরেই এই কৃত্রিম রঙ শিল্প ফুলে ফেঁপে উঠল। এরপর ১৮৬৬ খৃঃ কেকিউল বেনজিনের চক্রাকার সংকেত (Benzene Ring Struc-

ture) আবিষ্কার করলেন এবং দেখা গেল এই চক্রের বিভিন্ন স্থানে এক বা একাধিক মৌল সংযোজিত করে নানা রকম ভিন্নধর্মী রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন করা সম্ভব। আলকাতরা শিল্প দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল। আজকের দিনে অতিপ্রয়োজনীয় জ্বালানি থেকে শুরু করে পৃথিবীর তাবৎ প্রসাধন সামগ্রী (কস্‌মেটিক্স), স্যাকারিন এমন কি সংশ্লেষিত স্থতিবস্ত্র পর্য্যন্ত বহু নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু রসায়নাগারেই তৈরী হয় এই বেনজিন এর খেলায়। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন শিল্পে যে প্রায় 10,000 এর মত রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হয় তার সিংহভাগ জুড়ে আছে এই সব জৈব রাসায়নিক।

কিন্তু বেনজিন যেমন মানুষকে বহু বিলাস ব্যসন উপহার দিয়েছে তেমনি বস্তুটি যে কী মারাত্মক ক্ষতিকারক তা আমরা পঞ্চম পরিচ্ছদে বিশদ আলোচনা করেছি। কিন্তু ক্যান্সার ছাড়াও বেনজিন বা বেনজিন যৌগের বিষক্রিয়ার বিভিন্ন চর্ম রোগ, রক্তাল্পতা (anaemia), অ্যাগ্রানুলোসাইটোসিস্ প্রভৃতি কুফল দেখা যায়। বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, ইণ্ডিয়ান অয়েল করপোরেশনের অর্থানুকুল্যে লক্ষ্মৌ-এর **I. T. R. C** তে গবেষণা করে দেখা গেছে পেট্রোল পাম্প কর্মীদের মধ্যে যে মাথার যন্ত্রণা, মাথা ঘোরা, নিদ্রাহীনতা ইত্যাদি পেশাগত উপসর্গ দেখা যায় তার জন্য দায়ী আলকাতরার থেকে আহৃত ফেনল্ নামক বস্তুটি।

সংশ্লেষিত রসায়নের মধ্যে লেটেক্স্ (Latex) এবং প্লাস্টিক আজকের জন-জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই দুই শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের পেশাগত আর্তিও বহুবিধ। স্পেনীয় ভাষায় "লেটেকস্" অর্থাৎ দুধ। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে অ্যামাজন নদীর উপত্যকা অভিযানের সময় একদল ফরাসী অভিযাত্রী "হিভিয়া" গাছের দুধের মত রস থেকে উৎপন্ন রবার জাতীয় বস্তুর নাম রেখেছিলেন "লেটেকস্"। কিন্তু বর্তমানে আমরা লেটেকস্ বলতে কৃত্রিম রবারই বুঝি। ক্লোর ব্যুটাডিন নামে পেট্রোলজাত এক রাসায়নিক পদার্থকে পলিমেরাইজ (Polymerize) করে কৃত্রিম রবার বা নিওপ্রিণ লেটেকস্ (Neoprene Latex) তৈরী হয়। তা ছাড়া অ্যাক্রাইলো নাইট্রাইল, ওরফে ভাইনিল সায়ানাইড্ থেকে যেমন কৃত্রিম অ্যাক্রাইলিন (acryline) সূতা তৈরী করা যায়, তেমনি কৃত্রিম রবারও তৈরী করা হয়।

১৯৩৩ সালে গিবসন এবং ফসেট পেট্রোলজাত এথিলিনকে পলিমেরাইজ

করে পলিথিলিন তৈরী করেন এবং ১৯৩৯ সালে ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি (I. C. I) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পলিথিলিন ওরফে পলিথিন তৈরী শুরু করেন। এই হল প্লাস্টিক শিল্পের সূত্রপাত, যার ব্যবহার আজ প্রায় ঘরে ঘরে। এই জাতীয় পদার্থের সঙ্গে ট্রাই-অরথো-ক্রেসিল ফসফেট (TOCP) যুক্ত করলে প্লাস্টিক বেশ নরম ও ব্যবহারোপযোগী হয় তাই TOCP জাতীয় পদার্থকে প্লাস্টিসাইজার বলে। পদার্থটি নিঃসন্দেহে আমাদের বহু উপকার করেছে কিন্তু এটি সিউডো-কোলিন এসটারেস (Pseudo-Choline estarase) এনজাইমের ক্ষতি ক'রে প্লাস্টিক শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের বহু রকম স্নায়ু বৈকল্য সৃষ্টি করে। I. T. R. C-র গবেষকরা বলেন যে এই ক্ষতি কেবল উক্ত পদার্থ সংশ্লিষ্ট পেশায় নিযুক্ত কর্মীরাই নয়, পরন্তু প্লাস্টিক বা পলিথিন ব্যবহারকারী জনসাধারণেরও হতে পারে।

পেশাগত ক্যান্সার

আজকের দিনে উন্নত দেশগুলিতে হৃদরোগের পরই মানুষের মৃত্যুর সব চেয়ে বড় কারণ ক্যান্সার ; হিসেব করে দেখা গেছে প্রতি ছ'জন মৃতের মধ্যে একজনের মৃত্যু ঘটে ক্যান্সারে। এটা ১৯৬৫-৬৬ সালের পরিসংখ্যান, আজ হয়ত সংখ্যাটা আরও ভয়াবহ। স্বভাবতই এই মৃত্যুদূতের শক্তিবৃদ্ধিতে শুভবুদ্ধি মানব সমাজ চিন্তিত। ইদানীং কালে ক্যান্সারের প্রকোপ বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করে প্রথমত প্রকাশ পেয়েছে যে এটি সাধারণত প্রোঢ় এবং বৃদ্ধদের ব্যাধি এবং মানুষের গড় জীবৎকাল ক্রমশ বেড়ে চলেছে বলে তারা অধিকতর সংখ্যায় ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে ; এবং দ্বিতীয়ত মনুষ্য সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ক্যান্সার উৎপাদী পদার্থের (carcinogen) সংখ্যা এবং তাদের ব্যবহার বেড়ে যাচ্ছে হুহু করে। ক্যান্সারের যাবতীয় কারণ বিশ্লেষণ করলে যদিও দেখা যায় যে পেশাগত কারণের সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কম, তবে পেশা বিপ্লবের দৌলতে নিতান্ত নগণ্যও নয়।

১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্যারাসেলসাস্ স্নিবার্গ খনি শ্রমিকদের ফুসফুসে এক রকম মারাত্মক রোগ লক্ষ্য করেছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই এই খনি থেকে বিভিন্ন ধাতু-আকর উত্তলিত হচ্ছে, প্রথমে তামা ও লোহা, পরে রূপা এবং অধুনা বিসমাথ, আর্সেনিক ও কোবল্ট। স্বতই প্যারাসেলসাস্ ব্যাধিটির নাম রেখেছিলেন ম্যালা-মেটালোরাম (Malla Metalorum) অর্থাৎ ধাতুজ আর্তি। পরে ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এগ্রিকোলা লক্ষ্য করলেন ধাতুজ ধূলা শ্বসিত হয়ে রোগটি সৃষ্টি হয়, কিন্তু আসল ক্ষতিকারক পদার্থটি তখনও চেনা যায়নি। প্রায় তিন শ' বছর পরে হেয়ারটিং ও হেস-এর (১৮৭৯ খৃঃ) গবেষণায় ধরা পড়ে, ব্যাধিটি একজাতীয় ক্যান্সার এবং এর জন্য বহুল পরিমাণে দায়ী খনিজ সিলিকার ধূলা। ক্রমশ আরও অনেক পেশায় শরীরের বিভিন্ন স্থানে ক্যান্সারের সম্ভাবনা ধরা পড়ে (নিচের তালিকা দ্রষ্টব্য)। কী কারণে এবং কী ভাবে ক্যান্সার হয় সে ব্যাপারেও বহুদিন ধরে গবেষণা হয়েছে এবং আজও হচ্ছে।

৮নং তালিকা : বিভিন্ন শরীরযন্ত্রে ক্যান্সারের কারণ ও তার আবিষ্কারক

সাল	আবিষ্কারক	শরীরযন্ত্র	কারণ
১৭৭৫ খৃঃ	পট্‌স্‌	চর্ম	চিমনির ভুসা
১৮২৭ „	?	চর্ম ও শ্বাস-যন্ত্রের ঝিল্লি	ক্রোমেট
১৮৭৯ „	হেয়ারটিং ও হেস	ফুস্‌ফুস্‌	সিলিকা
১৮৯৫ „	রেন	মূত্রাশয়	অ্যানিলিন রঙ
১৯৩৫ „	লিঙ্ক ও স্মিথ	ফুস্‌ফুস্‌	অ্যাসবেস্‌টস
১৯৩৭ „	কিনোসোটা	লিভার*	বাটার ইওলো

৯নং তালিকা : পেশাগত ক্যান্সার

পেশা	নিমিত্ত	শরীরাংশ
চিমনি পরিষ্কারক, ব্রাউন কয়লার পাতনকারী	কয়লা থেকে প্রাপ্ত দগ্ধ পদার্থ	অণ্ডথলি ও অন্য স্থানের চর্ম
পেটেন্ট ফুয়েল প্রস্তুত কারক	শেল তৈল	চর্ম
নৌকা প্রস্তুতকারক, রাস্তা মেরামতকারী ইত্যাদি যাঁরা পিচ ও আলকাতরার সংস্পর্শে আসেন।	পলিসাইক্লিক হাইড্রোকার্বন	চর্ম
সুতাকাটা কলে যাঁরা কাজ করেন	খনিজ তৈল	চর্ম (অণ্ডথলি ও অন্য স্থানের)
স্নিবার্গের খনি শ্রমিক	তেজস্ক্রিয় রশ্মি (রেডন)	ফুসফুস্‌
কৃষক ও নাবিক	সূর্যরশ্মি (অতি বেগুনী ও অ্যাকটিনিক)	চর্ম

* এটি দেখা গেছল ইঁদুরে ; মানুষে বড় একটা দেখা যায় না।

পেশা	নিমিত্ত	শরীরাংশ
যাঁরা আকর গলিয়ে আর্সেনিক পৃথক করেন	আর্সেনিক	অণ্ডথলি
রঞ্জক পদার্থ প্রস্তুত কারক	বেন্‌জিডিন্, ∝ ও β ন্যাপথলামিন	মূত্রপথ
রেডিওলজিস্ট ও রেডিও-গ্রাফার	রঞ্জেন রশ্মি	চর্ম
রান্নার কোল গ্যাস প্রস্তুত-কারক	পলিসাইক্লিক হাইড্রোকার্বন, ∝ ও β ন্যাপথলামিন	ফুসফুস, মূত্রপথ
মাসটার্ড গ্যাস (কাঁদুনে গ্যাস) প্রস্তুত কারক	কাঁদুনে গ্যাস	ফুসফুস, স্বনন যন্ত্র, সাইনাস্
রসায়নাগার কর্মী	4-অ্যামাইনো ডাইফেনিল	মূত্রাশয়
পি. ভি. সি প্রস্তুত কারক	ভাইনিল ক্লোরাইড মনোমার	যকৃৎ
পরজীবী, সন্ধিপদ, কীট ধ্বংসের জন্য ভেড়াদের যাঁরা রাসায়নিক তরলে ডোবান (Sheep Dip), দ্রাক্ষাক্ষেত কর্মী	আর্সেনিক	ফুসফুস
হিমাটাইট্ খনি শ্রমিক	রেডন	ফুসফুস
অ্যাসবেসটস্ কর্মী বা অন্তরণ কর্মী	অ্যাসবেসটস	প্লুরা ও পেরিটোনিয়াম
ক্রোমেট শিল্প কর্মী	ক্রোমেট	ফুসফুস
আয়ন একসচেঞ্জ রেসিন	বিস্ (2-ক্লোরো-মেথিল) ইথার	ফুসফুস
নিকেল শোধন কর্মী	আকরিক নিকেল	ফুসফুস ও সাইনাস্
কাঠের মিস্ত্রী	শক্ত কাঠের গুঁড়া	সাইনাস্

পেশা	নিমিত্ত	শরীরাংশ
আইসোপ্রোপানল প্রস্তুত কারক	আইসোপ্রোপিল তৈল	সাইনাস্
আঠা বা বার্ণিশ কর্মী	বেনজিন	মজ্জা
অনুপ্রভ বস্তু ব্যবহারকারী শ্রমিক	তেজস্ক্রিয় রশ্মি	অস্থি ও রক্ত
রবার শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তি	∝ ও β নেপথলামিন	মূত্রাশয়
ফ্লুওস্পার খনি শ্রমিক	রেডন জাত তেজস্ক্রিয় রশ্মি	ফুসফুস
চামড়া শিল্পের কর্মী	অজ্ঞাত	সাইনাস
খবরের কাগজ এবং ছাপাখানা সংক্রান্ত পেশা	কালি	ফুসফুস

১০নং তালিকা : যে যে কারণে কেবল পেশাবিশেষে নিযুক্ত ব্যক্তি নয়, পরন্তু পরিবেশ দূষিত হয়ে অন্য ব্যক্তিদের শরীরেও ক্যান্সার সৃষ্টি হয়।

(ডল, ১৯৭৭ অনুযায়ী)

ক্ষতিকারক পদার্থ	শরীরে যে স্থানে ক্যান্সার হয়
(১) তেজস্ক্রিয় রশ্মি	ক্লোম শাখা, চর্ম, অস্থি, মজ্জা
(২) ভুসা, আলকাতরা (Tar) এবং তৈলের পলিসাইক্লিক হাইড্রোকার্বন	ক্লোম শাখা, অণ্ডথলির চর্ম
(৩) আর্সেনিক	চর্ম, ক্লোম শাখা
(৪) অ্যাসবেসটস	ক্লোম শাখা, প্লুরা, পেরিটোনিয়াম
(৫) ভাইনিল ক্লোরাইড	যকৃৎ
(৬) অতিবেগুনী রশ্মি	চর্ম

ক্ষতিকারক পদার্থ	শরীরে যে স্থানে ক্যান্সার হয়
(৭) অ্যারোমেটিক এমাইন β ন্যাপথলামিন ∝ ” বেনজিডিন δ অ্যামাইনো ডাইফেনিল	মূত্রাশয়
(৮) বিস্-ক্লোরোমেথিল ইথার	ক্লোম শাখা
(৯) বেনজিন	মজ্জা (লিউকিমিয়া)
(১০) মাসটার্ড গ্যাস	ক্লোম শাখা, স্বনন যন্ত্র, নাকের সাইনাস
(১১) নিকেল আকর	ক্লোমশাখা, নাকের সাইনাস
(১২) আকরিক ক্রোম	ক্লোম শাখা
(১৩) ক্যাডমিয়াম	প্রস্টেট গ্রন্থি
(১৪) হার্ড উড বা চর্ম-শিল্পে যে আইসো প্রোপিল তেল ব্যবহার হয়	নাকের সাইনাস

জীবকোষের প্রাণ ভোমরা ক্রোমোজোম এবং ক্রোমোজোমের মূল রসায়ন ডি. এন. এ প্রোটিন। এই প্রোটিন অণুর পরিব্যক্তির (বা মিউটেশনের) ফলে কোষগুলির উদ্দাম এবং এলোমেলো বংশবৃদ্ধি থেকেই শরীরের বিভিন্ন কলায় ক্যান্সার দেখা দেয়। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে বেরেনব্লুম এবং রাউস (Berenblaum and Rous) যথাক্রমে ইঁদুর ও খরগোসের ওপর পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে ক্যান্সার হতে গেলে দুটি কারণ থাকা চাই (ক) বয়স, লিঙ্গ পরিচিতি, বংশগতি ইত্যাদি পরোক্ষ বা Initiating Factors এবং (খ) প্রত্যক্ষ বা Specific Promoting Factors, যার মধ্যে বেশ কিছু পেশাগত। ফ্যাক্টর-গুলি ক্রোমোজমের পরিব্যক্তি বা মিউটেশনের জন্য দায়ী বলে এদের মিউটা-জেনও বলা হয়ে থাকে। পেশাগত ক্যান্সারের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়—যথা এ জাতীয় ক্যান্সার অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে দেখা যায়, পুরোপুরি ক্যান্সারে পরিণত হবার আগে কর্মীদের শরীরে আঁচিল বা ডার্মাটাইটিস প্রভৃতি কতগুলি

অগ্রদূত (Precancerous Conditions) দেখা যায় যারা ভবিষ্যতে ক্ষতিকারক রূপ নেয়। তা ছাড়া পেশাগত ক্যান্সার হতে গেলে বৃত্তি বিশেষে বেশ কয়েক বছর নিযুক্ত থাকা দরকার এবং এও দেখা গেছে যে কোন ক্ষতিকারক পেশায় বেশ কয়েক বছর নিযুক্ত থাকার পর সেই পেশা পরিত্যাগ করলেও ভবিষ্যতে ক্যান্সারের সম্ভাবনা থেকে যায়। নিচের তালিকায় কোন ক্ষতিকারক পদার্থ নিয়ে কতদিন কাজ করলে কত বছর পরে ক্যান্সার হতে পারে তা দেখান হল।

১১নং তালিকা ঃ

কার্সিনোজেনিক পদার্থ	কোথায় ক্যান্সার হয়	অন্তত কতদিন পেশায় নিযুক্ত থাকা দরকার	আন্দাজ কতদিন পরে ক্যান্সার হয়
মিউল স্পিনারস্, লুব্রিকেটিং অয়েল	স্ক্রোটম (অণ্ডথলি)	কমপক্ষে 16 বছর	50 বছর
পিচ্ ও টার	চর্ম	,, 10 মাস	20-24 ,,
শেল অয়েল	,,	,, 4 বছর	50-59 ,,
বেনজিডিন্	মূত্রাশয়	গড়ে 8 বছর	16 ,,
বিটা ন্যাপথলামিন	,,	,, 5 বছর	,, ,,
জেনিলামিন	,,	কমপক্ষে 131 দিন	15-20 ,,
আর্সেনিক	চর্ম	বহু বছর	2-60 ,,
অ্যাসবেসটস্	ফুসফুস	7-21 বছর	10-12 ,,
ক্রোমেট	,,	—	27 ,,
রেডিয়াম ও মেসোথোরিয়াম	অস্থি	কমপক্ষে 6 মাস	17 ,,

কোন শ্রমিক জীবনে কোন সময় ক্যান্সারে আক্রান্ত হলে তার জন্য পেশাকে দায়ী করা যায় কী না নির্ধারণ করতে এই সময় সীমা জেনে রাখার প্রয়োজন; এর সঙ্গে আইনগত প্রশ্ন জড়িত। পেশায় যোগ দেওয়া এবং ক্যান্সার দেখা দেওয়ার মধ্যে সময়ের ব্যবধান অর্থাৎ অন্তর্লীনকাল (Latent Period) লক্ষ্য

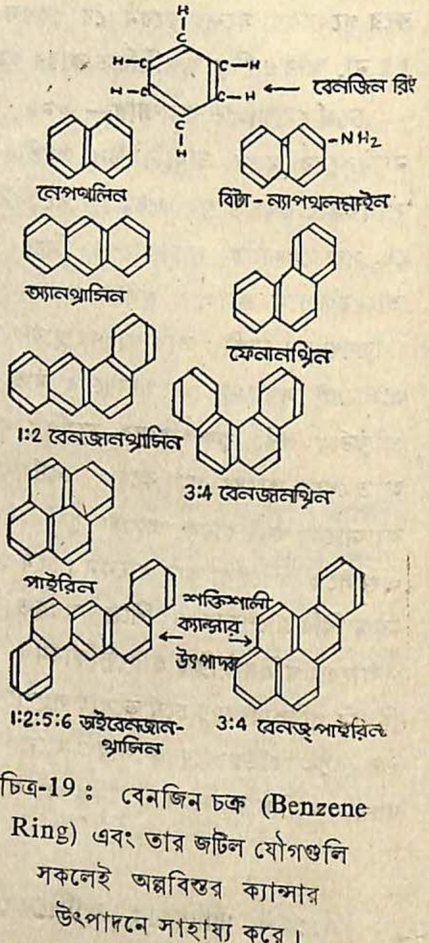
করে গবেষকরা সন্দেহ করেন যে কেবল প্রোমোটিং ফ্যাক্টর হলেই ক্যান্সার হয় না, আরও কিছু অন্তর্নিহিত কারণ হয়ত থাকে।

চর্মে পেশাগত ক্যান্সার—১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে উন্না সূর্য্যালোকের প্রভাবে নাবিকদের মধ্যে ডার্মাটাইটিস জাতীয় চর্ম রোগ ও তা' থেকে ক্যান্সারের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন। পরে দেখা গেল চাষ-আবাদ, মাছধরা প্রভৃতি যে সব পেশাতে মুক্তাকাশের নিচে প্রখর সূর্যালোকে কাজ করতে হয় তাদেরই চর্মে ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা। শ্বেতকায়রাই এ জাতীয় ক্যান্সারে আক্রান্ত হন বেশী; তার কারণ, সূর্য্যের অ্যাকটিনিক রশ্মির (Actinic Rays) প্রভাবেই মুখমণ্ডল ও ওষ্ঠাধরের মত অনাচ্ছাদিত স্থানে এই ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব এবং কৃষ্ণকায়দের চর্মের মেলানিন পিগমেণ্ট এই ক্ষতিকারক রশ্মির হাত থেকে তাদের রক্ষা করে। চর্মের স্কোয়ামাস ও বেসাল কোষ জাত এই ক্যান্সারের ক্ষতিকারক ক্ষমতা খুবই কম বলে আক্রান্ত ব্যক্তিরা সাধারণত এগুলিকে অবহেলা করে থাকেন। চর্মে পেশাগত ক্যান্সারের সবচেয়ে বড় কারণ কিন্তু বিভিন্ন পেশায় ও শিল্পে ব্যবহৃত বেনজানথ্রাসিন এবং বেনজপাইরিন পর্য্যায়ের পলিসাইক্লিক হাইড্রোকার্বন। সার পারসিভাল পট্ ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে চিমনি পরিষ্কারকদের চর্মে ভুসোর সংস্পর্শে ক্যান্সার হওয়ার ঘটনা লক্ষ্য করার পর থেকে বিভিন্ন গবেষক আরও অনেক বস্তুর সংস্পর্শে চর্মে ক্যান্সার উদ্ভবের ঘটনা আবিষ্কার করেন। কিন্তু এই সব বস্তুর আসল ক্ষতি কারক উপাদনের

১২নং তালিকা: কার্সিনোজেন আবিষ্কারের ক্রমপর্য্যায়

কার্সিনোজেন	আবিষ্কারক	সাল
প্যারাফিন তৈল	বেল্	১৮৭৬ খ্রী:
লিগ্‌নাইট্ কোল টার	ভল্ক্‌ম্যান	১৮৭৬ খ্রী:
পিচ্ (বিটুমেন)	বাটলিন	১৮৯২ খ্রী:
পেট্রোলিয়ামজাত প্যারাফিন	স্ক্যামবার্গ	১৯১০ খ্রী:
শেল অয়েল	উইলসন্	১৯১০ খ্রী:
ক্রিয়োসোট	ও-ডনোভান	১৯৩০ খ্রী:
মবিল জাতীয় তৈল	হেলার	১৯৩০ খ্রী:

কথা বহুদিন অজ্ঞাত ছিল। ১৯১৮ সালে ইয়ামাগিউয়া ও ইসিকাওয়া নামে দুই জাপানী গবেষক গবেষণাগারে ইঁদুর, খরগোস ইত্যাদি প্রাণীদের চামড়ায় কোলটার (আলকাতরা) লাগিয়ে লাগিয়ে কৃত্রিম উপায়ে ক্যান্সার সৃষ্টি করার পর থেকে বেনজিন নামক গন্ধযুক্ত হাইড্রোকার্বনের (Aromatic Hydrocarbon) ক্যান্সার সৃষ্টিকারী ক্ষমতার দিকে গবেষকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল এবং অবশেষে সার আর্নেস্ট কেনাওয়ে 1 : 2 : 5 : 6 ডাইবেনজানথ্রাসিনকে (Dibenzanthracene) এই ক্ষতির জন্য সরাসরি দায়ী করলেন।



চিত্র-19 : বেনজিন চক্র (Benzene Ring) এবং তার জটিল যৌগগুলি সকলেই অল্পবিস্তর ক্যান্সার উৎপাদনে সাহায্য করে।

সূর্য্যরশ্মি বা হাইড্রোকার্বন ছাড়াও আরও অনেক পদার্থের সংস্পর্শে চর্মে ক্যান্সার হতে পারে। এদের মধ্যে বিশেষ আলোচ্য হ'ল তেজস্ক্রিয় পদার্থ জনিত চর্মের ক্যান্সার (তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) এবং আর্সেনিক। সেঁকো বিষ ফুসফুস, যকৃৎ বা মূত্রাশয় ছাড়াও চর্মে ক্যান্সার সৃষ্টি করে। রঙ, কালি, বা রবার শিল্পে এবং ইলেকট্রোপ্লেটিং (Electroplating), এনামেলিং করা (enameling) বা ফটোগ্রাফি পেশায় আর্সেনিকঘটিত রাসায়নিক পদার্থ প্রচুর ব্যবহৃত হয় এবং এই সব উপজীবীদের কুক্ষি, কুঁচকি, হস্ত ও পদতল ইত্যাদি স্থানেই আর্সেনিকজাত ক্যান্সার বেশী দেখা যায়। আমাদের

চিত্র 19-এ (১) 3 : 4 বেনজানথ্রিনের পরিবর্তে 3 : 4 বেনজফেনানথ্রিন হবে।
(২) ন্যাপথলামাইনের বিকল্প উচ্চারণ ন্যাপথলামিন।

মত গ্রীষ্ম প্রধান দেশের শ্রমিকরা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অন্য কোন নিয়ম মানুন আর না মানুন, নিত্য স্নানটা করে থাকেন, তা ছাড়া ঘর্মপ্রবাহ তো আছেই ; এদেশে চর্মের ক্যান্সারের ঘটনা তুলনামূলক ভাবে কম হবার এও একটা কারণ।

ফুসফুসের পেশাগত ক্যান্সার—খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দীতে স্নিবার্গের খনি শ্রমিকদের ফুসফুসে ক্যান্সারের ঘটনা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। স্নিবার্গের কাছেই জোয়াচিমিস্‌টালের খনি থেকে যে পিচ্‌ব্লেণ্ডআকর পাওয়া যেত, তার থেকে তেজস্ক্রিয় রেডিয়াম ও পোলোনিয়াম স্বতন্ত্র করে মাডাম কুরী জগৎ বিখ্যাত হন (১৮৯৮ খ্রীঃ)। পিচ ব্লেণ্ডে রেডিয়াম ক্লোরাইডের সঙ্গে ইউরেনিয়ম নামে তেজস্ক্রিয় ধাতুটি মেশান থাকে। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে বিভিন্ন প্রতিবেদন সংকলিত করে লোরেঞ্জ হিসাব করেন যে ১৮৭৫ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত ওই স্থানের খনিতে কর্মরত 336 জন শ্রমিক ফুসফুসের ক্যান্সারে মারা যান। তেজস্ক্রিয় পদার্থের ক্যান্সার সৃষ্টি করার ক্ষমতা চিন্তা করলে মৃত্যুর এই পরিসংখ্যান এমন কিছু বেশী নয়। কৃত্রিম বা প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়া ছাড়াও বিভিন্ন পেশাগত ও অপেশাগত কারণে ফুসফুসের ক্যান্সারের সংখ্যা ইদানীং কালে খুবই বেড়ে গেছে। ১৯০৭ সালে ইংলণ্ড ও ওয়েলসে এই রোগে মৃতের সংখ্যা যেখানে ছিল 297, ১৯৬৩ সালে সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 23 হাজার। অনস্বীকার্য্য যে আর্তি হিসেবে ফুসফুসের ক্যান্সার প্রকট হতে বেশ কিছুদিন সময় নেয়, তাই বর্তমান কালের এক্স-রে ইত্যাদি রোগ নির্ণয়ের উপায়গুলির বহুল প্রচলন হওয়ার আগে পর্য্যন্ত রোগটি সহজে ধরা পড়ত না। কিন্তু এতদ্বারা কখনই সিদ্ধান্ত করা যায় না যে ফুসফুসের ক্যান্সারের এই বৃদ্ধিটা আপাত মাত্র। যে দিন থেকে রাসায়নিক শিল্প বিপ্লব শুরু হয়েছে এবং যেদিন থেকে মানুষ গ্রামাঞ্চল ছেড়ে দলে দলে শহরমুখী হয়েছে সেদিন থেকেই তারা অন্তত এ ব্যাপারে আপন সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করেছে বলা যায়। ধূমপানের (বিশেষ করে সিগারেট) প্রবণতা, মারাত্মক হাইড্রোকার্বন সমন্বিত কলকারখানা এবং গাড়ীর ডিসেল ফিউম দিয়ে পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি বহু কারণে প্রকৃতপক্ষেই আজ অনেক মানুষ ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে। পেশার কথা বলতে গেলে, এমন কি করাত কলে কর্মরত শ্রমিকরাও

এই রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। তবে অনুসন্ধানে দেখা যায় কয়েকটি ধাতুর ধূলা এ ব্যাপারে ভয়ঙ্কর ক্ষতিকারক।

ক্রোমেট—ক্রোমিয়াম যৌগের প্রভাবে যে নাসিকা, ক্লোম শাখা থেকে শুরু করে ফুসফুস পর্য্যন্ত শ্বাসনালীর যে কোন অংশে ক্যান্সার হতে পারে এতথ্য প্রথম জানা যায় ১৮২৭ সালে। ১৯৩০ সালে ম্যাক্‌ল্ ও গ্রেগোরিয়াস্ লক্ষ্য করেন যে ক্রোমেটের সংস্পর্শে ফুসফুসে ক্যান্সারের সম্ভাবনা সাধারণের থেকে 16-80 গুণ বেশী। লক্ষনীয়, ক্রোম খনিতে যাঁরা কাজ করেন অথবা বাইক্রোমেট বা ক্রোমিক এসিড নিয়ে কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে রোগটির প্রাদুর্ভাব অপেক্ষাকৃত কম অথচ মনোক্রোমেটের সংস্পর্শে ক্যান্সার হয় সর্বাধিক।

নিকেল ও কোবল্ট—ঠিক এই দুটি ধাতু থেকেই যে ফুসফুসের ক্যান্সার হয় একথা জোর করে বলা যায় না; আকরিক অবস্থায় এই সব ধাতুগুলির সঙ্গে যে আর্সেনিক গুঁড়া মিশে থাকে সেটিই হয়ত আসল ক্যান্সার সৃষ্টিকারী পদার্থ। দেখা গেছে নিকেল ও আর্সেনিক রিফাইনারিতে কর্মরত শ্রমিকদের ফুসফুসে ক্যান্সারের সম্ভাবনা সাধারণের চেয়ে অন্তত পাঁচগুণ বেশী।

অ্যাসবেসটস্—ফুসফুসে অ্যাসবেসটোসিস রোগের (নবম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) সঙ্গে ক্যান্সারের সম্বন্ধের কথা প্রথম উল্লেখ করেন ওয়াইয়ার। সাধারণ শ্রমিকের চেয়ে অ্যাসবেসটস্ নিয়ে কর্মতর শ্রমিকদের মধ্যে এ রোগের সম্ভাবনা অন্তত 10 গুণ বেশী। কিন্তু সব জাতের অ্যাসবেসটস্‌কেই যে সমান ভাবে দায়ী করা যায় তা নয়, ক্রোসিডোলাইট জাতীয় অ্যাসবেসটস্ থেকেই ফুসফুসের ক্যান্সার হয় সর্বাধিক। এই বস্তু ধূলির আকারে ফুসফুসে অনুপ্রবেশ করে সেখানে স্থানে স্থানে fibrosis এবং "অ্যাসবেসটস্ বডি" সৃষ্টি করে। এগুলিই ক্যান্সারের অগ্রদূত।

মূত্রপথের পেশাগত ক্যান্সার—ভারত শোষণ করে ইংরাজরা একসময় পৃথিবীর নীল রঙের বাজার একচেটিয়া করে নিয়েছিল। তারপর বেয়ার প্রমুখ রসায়নবিদ্‌দের প্রচেষ্টায় রসায়নাগারে সংশ্লেষিত নীল রঙ (Aniline Blue) তৈরী হতে শুরু করল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কোল টার থেকে এই রঙ তৈরীর কারখানা ব্যাঙের ছাতার মত জার্মানীতে গড়ে উঠেছিল এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এই শিল্প ছড়িয়ে গেছল প্রায় সারা পৃথিবীতে।

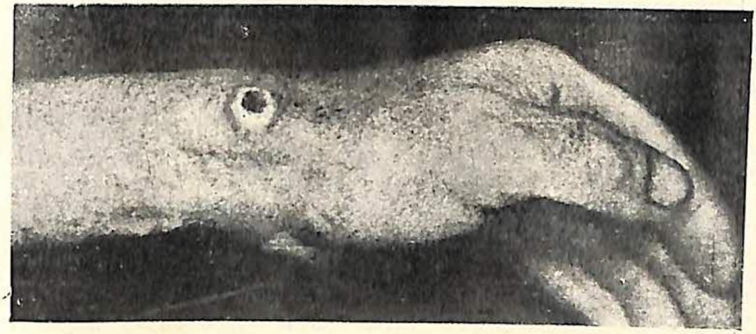
কিন্তু দেখা গেল বেশ কিছু শ্রমিক মূত্রাশয়ের ক্যান্সারে ভুগছে। ১৯২১ সালে অন্তর্জাতিক সংস্থার দৃষ্টি এই পেশাগত রোগের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাঁরা স্বীকার করেন যে অ্যানিলিনের অ্যারোম্যাটিক এমাইনগুলিই আসল ক্ষতি কারক রসায়ন। এর মধ্যে বেনজিডিন্ ও বিটা-ন্যাপথলামিন রসায়ন দুটিই মূত্র পথের (বৃক্ক নালী, মূত্রাশয় ও বহিঃ মূত্রপথ) বিভিন্ন স্থানের সংস্পর্শে ক্যান্সার সৃষ্টি করে। রসায়নগুলি রবার শিল্পেও বহুল ব্যবহৃত হয় সুতরাং ওই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকরাও মূত্রপথের ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে পারেন। এই রসায়ন গুলির সংস্পর্শে কেবল মূত্র পথেই কেন ক্যান্সার হয়, বয়ল্যাণ্ড তার কারণ সম্বন্ধে বলেন যে রাসায়নিক গুলি বৃক্কের মাধ্যমে ঘনীভূত হলে এদের কার্য্য-কারিতা বেড়ে যায়।

পরবর্তী গবেষণায় জানা গেছে ব্যাটারী শিল্পে ব্যবহৃত ক্যাডমিয়ামের প্রভাবে প্রস্টেট্ গ্রন্থিতেও ক্যান্সার হতে পারে।

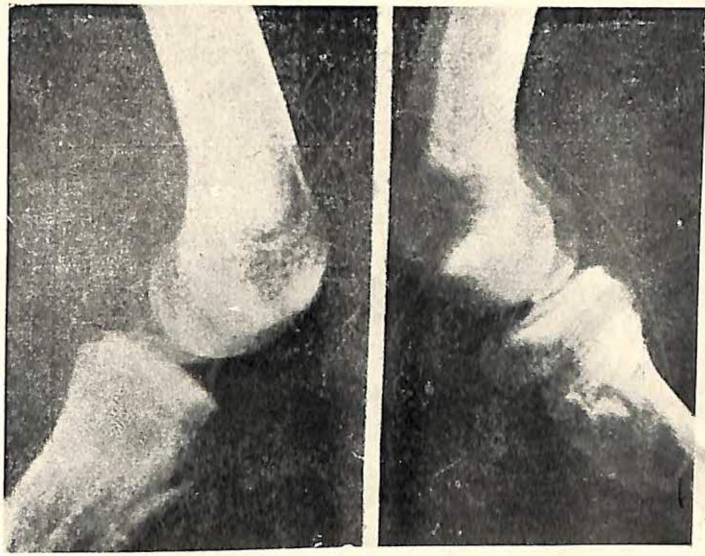
পেশাগত ক্যান্সার নিবারণ কল্পে চিমনি পরিষ্কারের মত উপরিউক্ত কিছু পেশা আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে [কার্সিনোজেনিক সাবস্ট্যান্স রেগুলেশনস (1967) দ্রষ্টব্য] কলকারখানাতেই ক্ষতিকারক হাইড্রোকার্বন সমন্বিত পদার্থ শ্রমিকদের দেহের সংস্পর্শে যাতে কম আসে তার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করা হয়ে থাকে। কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা, রসায়নবিদ্‌রা এই সব ক্ষতিকারক পদার্থের নিরাপদ বিকল্প খুঁজে বার করতে বদ্ধপরিকর।

চিকিৎসক সমাজও ক্যান্সার নির্ণয় ও তার চিকিৎসার উন্নতি করতে সমান ভাবে আগ্রহী। কলকারখানার শ্রমিকদের মধ্যে mass miniature X'-Rayর ব্যবস্থা করে, কমপ্যুটারাইজড অ্যাক্সিয়াল টোমোগ্রাম স্ক্যানিং (CATSCAN) এর মত অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে আশু ক্যান্সার নির্ণয়ের চেষ্টা চলছে। তা ছাড়া বায়পসি (Biopsy) করে ক্যান্সার নির্ণয়ের বহু আগেই আলট্রা স্পেকট্রো ফটোমিটারে নিয়মিত রক্তের ডি. এন. এ প্রোটিন মেপে শরীরে ক্যান্সারের উপস্থিতি বোঝা যায়। Mass Sonograph বা A.G.A Thermovision ইত্যাদি যন্ত্রও ক্যান্সার নির্ণয়ের সুবিধা করে দিয়েছে। ক্যান্সার চিকিৎসারও উন্নতি হয়েছে। অঙ্কলজিস্ট বা ক্যান্সারবিশারদরা একমত যে প্রাথমিক অবস্থায় ক্যান্সার ধরা পড়লে এ রোগ নিরাময় সম্ভব।

অন্তত মেলানোমা ছাড়া আর সব চর্ম ক্যান্সার নিরাময়ের আশা খুবই উজ্জল। সর্বোপরি মনে রাখা প্রয়োজন সার রিচার্ড ডল এর বিখ্যাত উক্তি "It is now clear......that most if not all cancers have environmental cause and can in principle be prevented." [রয়েল ইনসটিটিউশনের সার আর্নেস্ট কেনাওয়ে (Sir Ernest Kennaway) বক্তৃতা (1976)] (এ কথাটি এখন পরিষ্কার যে সব না হোক অধিকাংশ ক্যান্সারের কারণ পরিবেশ এবং নীতিগতভাবে ক্যান্সারের উদ্ভব বন্ধ করা সম্ভব)



চিত্র 20 : শেল অয়েল লেগে নিচে হাতে ক্যান্সার হয়েছে।



চিত্র 21 : উচ্চ বায়ুচাপে কর্মরত শ্রমিকরা দ্রুত স্বাভাবিক চাপে পুনঃপ্রবেশ করলে রক্তে দ্রবীভূত বায়ু বুদবুদের আকারে বেরিয়ে অনু-ধমনীগুলি বন্ধ করে দেয়। চিত্রে দেখা যাচ্ছে, এইরকম বুদবুদের জন্য হাঁটুর আশপাশের হাড়ে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে পচন ধরেছে।

(পৃঃ ৩৬ দ্রষ্টব্য)



চিত্র 22 : বিষাক্ত গ্যাস উদ্গীরণকারী রাসায়নিক দ্রব্য নিয়ে কাজ করার সময় গ্যাস মুখোশ ব্যবহার করা উচিত।

(পৃঃ ৫৪ দ্রষ্টব্য)



চিত্র 23 : ছেদক গিলোটিন যন্ত্র নিয়ে কর্মরত শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য আধুনিক ইলেকট্রনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

(পৃঃ ৮৪ দ্রষ্টব্য)

পেশাগত চর্মরোগ

পেশাগত চর্মরোগ এতই সাধারণ আর্তি যে গল্পে উপন্যাসে পর্য্যন্ত এই রোগ দেখে রোগীর পেশা বলে দেওয়ার কথা শোনা যায় এবং তার জন্য অনেক সময় আর বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয় না, একজন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন পর্য্যবেক্ষকই তা' পারেন। উদাহরণস্বরূপ শার্লক হোমসের কথাই ধরা যাক্। "You know my methods Watson ; surely you noticed the patch of acneform dermatitis beneath the angle of the left mandible ?" (ওয়াটসন, তুমিতো আমার কর্মপদ্ধতি জান! (ব্যক্তিটির) চোয়ালের বাঁ কোণে ব্রণ জাতীয় চর্মরোগটি তুমি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ ?) অতএব হোমসের সিদ্ধান্ত, গল্পে বর্ণিত ব্যক্তি একজন বেহালা বাদক। অবশ্য বিশেষজ্ঞরা হয়ত বলবেন তখনকার দিনে বেহালা পালিশ করতে যে রং ব্যবহার করা হত বা কাঠের অ্যালার্জি থেকেই ব্যক্তিটির চোয়ালের কোণে ডার্মাটাইটিস হয়ে থাকবে। হোমসের দরকার নেই, বাঁকিদের কাঁধের কড়া দেখে আমরাও তাদের পেশা বলে দিতে পারি বইকি !

চর্ম এমনই একটি শরীরাংশ যা প্রতিনিয়ত বহিঃ পরিবেশের সংস্পর্শে আসছে। স্বতই এই প্রত্যঙ্গের ওপর পেশাগত পরিবেশের প্রভাবও যথেষ্ট। চর্মের ওপর বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের প্রভাব, ভৌত পরিবেশের প্রভাব ইত্যাদি যথাযথ পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে, এখানে পেশাগত চর্ম রোগের পর্য্যায় বিন্যাস এবং তাদের সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে আলোচনা করা হবে।

অ্যালার্জিক ডার্মাটোসিস: অপদ্রব্যের প্রতি চর্মের স্পর্শকাতরতা (contact sensitization) মুদি, বেকার (Baker), সূপকার ইত্যাদি পেশায় চিনি অথবা ময়দার সংস্পর্শে ; মালি বা চাষীদের গাছ, কাঠ, কীটনাশক ওষুধ, সার ইত্যাদির অ্যালার্জি থেকে, অথবা মোটর মেকানিক, ছাপাখানার শ্রমিক, পালিশ মিস্ত্রী, ট্যানার, ফটোগ্রাফার ইত্যাদি পেশায় বিভিন্ন অপদ্রব্যের সংস্পর্শে কর্মীদের চামড়ায় অ্যালার্জিক ডার্মাটোসিস অত্যন্ত পরিচিত ঘটনা।

এ রোগের হাত থেকে ডাক্তার, নার্স, শল্য চিকিৎসক, দন্ত চিকিৎসক কেউই বাদ যান না।

পেশাগত অপদ্রব্যগুলি সাধারণতঃ বহিরাগত, তবে ভাবপ্রবণতার মত কিছু অন্তর্নিহিত কারণও পেশাবিশেষে নিযুক্ত ব্যক্তিদের চর্মরোগ সৃষ্টি করতে পারে। ডেসমণ্ড মরিস এর এক সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন। এক নির্মোক নর্তকীর যখন কাজ করতে ভাল লাগত না, তখন তার শরীরে সত্যি সত্যি আমবাতের মত চর্মরোগ দেখা দিত। বস্তুত অনেক চর্মরোগই মানসিক কারণে হয়ে থাকে এবং বিশেষজ্ঞরা তাদের সাইকো-সোমাটিক ব্যাধি পর্য্যায়ভুক্ত করেন। প্রখ্যাত চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ রুকের মতে অপদ্রব্যের প্রতি স্পর্শকাতরতা (contact sensitization) বশত যে ডার্মাটোসিস হয় তার সঙ্গে মানসিকতার গভীর সম্বন্ধ রয়েছে। হয়ত সেই কারণেই আমাদের দেশে বিভিন্ন কলকারখানায় ক্ষতিকর পদার্থ নিয়ে যে সব শ্রমিক কাজ করেন তাঁদের মধ্যে এ জাতীয় পেশাগত চর্মরোগের সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কম অথচ বিলাতের জাতীয় বীমা (পেশাগত আর্তি) আইনে যত ক্ষতিপূরণ দাবী করা হয় তার প্রায় শতকরা 90 ভাগই চর্মরোগের জন্য।

অপদ্রব্যের প্রতি স্পর্শকাতরতা ছাড়াও ক্রোম প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ, এক্স-রে প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় রশ্মি, অ্যানথ্র্যাক্স প্রভৃতি বিভিন্ন জীবাণু বা হুকওয়ার্ম, অ্যাকারিড (ময়দায় পাওয়া যায়) ইত্যাদি পরজীবীরা সরাসরি চামড়ার ক্ষতি করতে পারে। তাই বিলাতি আইনে পেশাগত চর্মরোগের সজ্ঞায় বলা হয়েছে "ইনফেকশন ছাড়াও বিভিন্ন পেশায় (ক্রোম ক্ষত সমেত) বহিরাগত অপদ্রব্যের সংস্পর্শে যে চর্মরোগ হয়।" অবশ্য এর থেকে তেজস্ক্রিয় রশ্মি জনিত চর্মরোগ বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে চর্মরোগের জন্য পেশাই দায়ী কি না খতিয়ে দেখতে লক্ষ্য রাখা হয় (১) যে অপদ্রব্য নিয়ে শ্রমিক কাজ করেন সেটি আদৌ চর্মরোগ সৃষ্টি করতে পারে কি না (২) সহকর্মীদের অন্য কারুর রোগটি হয়েছে কি না (৩) পেশাবিশেষে নিয়োগ ও রোগের আবির্ভাবের মধ্যে সঙ্গত সময়ের ব্যবধান আছে কি না (৪) পেশাবিশেষে যে স্থানে চর্মে রোগটি হওয়া উচিৎ শ্রমিকবিশেষে সেই স্থানেই হয়েছে কি না (৫) পেশায় নিযুক্ত হবার পর contact sensitization হলে কর্মীকে পেশা থেকে সাময়িকভাবে সরিয়ে

দিলে রোগটি ভাল হয় কি না এবং (৬) অপদ্রব্যটি পরীক্ষামূলকভাবে এক স্থানের স্বল্প পরিমাণ স্থানে লাগালে রোগটি হয় কি না।

প্রদাহী চর্মরোগ (Irritant Dermatitis): অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখলে দেখা যায় চর্মের বহিঃতম স্তরটি (Horny cell layer) কতগুলি মৃত কোষের সমষ্টি এবং এই স্তরের বহিঃতল সদা সর্বদাই ঘাম ও সিবাম রূপ জল-তেলে ভিজে থাকে। এই স্তরটি আছে বলেই বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ বা অতিবেগুনী রশ্মি ইত্যাদি ক্ষতিকারক পদার্থ চর্মের গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। তবে বহু ক্ষেত্রেই, যেমন কেটে ছড়ে গেলে, ঘাম ও সিবাম ক্ষরণ বন্ধ হয়ে স্থানবিশেষে এই স্তর ঝরে পড়লে (Exfoliation) অথবা এসিড ইত্যাদি রাসায়নিকের সংস্পর্শে এই স্তরটি যদি নষ্ট হয়ে যায়, ক্ষতিকারক পদার্থগুলি সরাসরি চর্মের গভীরে প্রবেশ করতে পারে। আবার এই স্তরটি নষ্ট না হয়েও ক্ষতিকারক পদার্থগুলি এর মধ্যে দিয়ে রোপিত (Implanted) বা পরিব্যাপ্ত (pervaded) হয়ে চর্মাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। অপদ্রব্যগুলি শরীরে প্রবেশের আর এক উপায় ঘর্ম বা সিবেসাস গ্রন্থিনালী বেয়ে। এই সব উপায়ে ক্ষতি-কারক পদার্থগুলি চর্মগভীরে না প্রবেশ করলে কিছুতেই সেখানে প্রদাহ সৃষ্টি হতে পারে না।

প্রদাহের ফলে আক্রান্ত স্থানে রক্ত চলাচল বেড়ে যায়, অনুধমনীগুলি প্রসারিত হয়, ফলে স্থানটি লাল ও গরম হয়ে ওঠে; সেখানে যন্ত্রণা অথবা চুলকানি দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত ওই স্থানের সব চর্মকোষ মরে যায় এবং ক্ষত সৃষ্টি হয়, ক্ষত থেকে রস গড়াতে থাকে অথবা এও দেখা যায় যে, Horny cell layer এর গভীরে যে জার্মিনাল সেল লেয়ার (Germinal cell layer) আছে সেটি যত দ্রুত ধ্বংস হয়ে ঝরে পড়ে ততই গভীরতম বেসাল সেল স্তর থেকে দ্রুততর হারে নতুন কোষ সৃষ্টি হয়ে Exfoliative dermatitis দেখা দেয়।

বহু পেশাগত কারণেই চর্ম প্রদাহ হতে পারে। তার মধ্যে অ্যালার্জি জনিত কারণ আগেই আলোচনা করা হয়েছে। লক্ষনীয়, সেখানে কিন্তু স্থানীয় চর্মে কখনই ক্ষত সৃষ্ট হয় না অথচ বেশীর ভাগ Infective dermatitis এর ক্ষেত্রেই চর্মে ক্ষত সৃষ্টি হয়; বিভিন্ন পেশায় ব্যবহৃত ক্রোম, ব্রাইন প্রভৃতি

রসায়নগুলি আবার গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে। প্রদাহী কারণগুলিকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

(১) ভৌত কারণ—চাপ, আঘাত, তাপ, আর্দ্রতা, শৈত্য, দৃশ্যালোক, এক্স-রে ইত্যাদি।

(২) উদ্ভিজ্জ কারণ—পাতা, কাণ্ড, শিকড়, ফুল, ফল, শাকসব্জি, কাঠের গুঁড়া, রেসিন ও গাছের আঁঠা ইত্যাদি।

(৩) প্রাণীজ কারণ—জীবাণু, ভাইরাস, ছত্রাক, পরজীবী, পোকামাকড়, উকুন ইত্যাদি।

(৪) রাসায়নিক পদর্থ—এসিড, অ্যালকালি, কসটিক, ময়লা পরিষ্কারক যৌগ (সাবান ইত্যাদি detergent), বিভিন্ন খনিজ তৈল, ধাতু, ও ধাতু যৌগ ইত্যাদি।

কার্য্যপ্রণালী অনুযায়ী আবার প্রদাহী চর্মরোগ গুলিকে (ক) acute irritant অর্থাৎ যারা সরাসরি তাৎক্ষণিক প্রদাহ সৃষ্টি করে এবং (খ) cumilative insult dermatitis) অর্থাৎ যারা বহুদিন ধরে চর্মের সংস্পর্শে আসতে আসতে হঠাৎ একসময় প্রদাহ সৃষ্টি করে, এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। দ্বিতীয় দলের পদার্থগুলির ক্ষতিকারক ক্ষমতা জীবাণু বা রশ্মির (আলোক বা তেজস্ক্রিয়) সহযোগে অনেক সময় তীব্র হয়ে ওঠে, এমনকি জলহাওয়ার দরুণও (যেমন গরম কালে অত্যাধিক ঘামের ফলে) এদের কার্য্যকারিতা বেড়ে যায়।

পেশাগত কারণে স্থান বিশেষে শরীরের বার্সাগুলির প্রদাহ, সেগুলিতে শ্লেষ্মা জমা, ফুলে যাওয়া অথবা নতুন বার্সা (advantitious bursa) তৈরী হওয়ার ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়। ১ নং তালিকায় তাদের কয়েকটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তা ছাড়া স্থান বিশেষে কড়া পড়ে যাওয়া তো আছেই। আমাদের দেশে বাঁকিদের কাঁধের বার্সা তার নিদর্শন।

চর্মের ঘর্ম ও সিবেসাসগ্রন্থির নালী অথবা রোমকূপে প্রদাহ হলে ফলিকুলাইটিস রোগ হয়। এগুলি পুঁজভর্তি ব্রণের মত দেখতে লাগে এবং হাত পায়েই এদের বেশী দেখা যায়। মোটর মেকানিক বা যাঁরা গাড়ী সার্ভিস

করেন তাঁদের প্রায়ই গ্রীজ্, মোবিল ইত্যাদি তৈলাক্ত পদার্থের সংস্পর্শে আসতে হয় বলে এঁদের হাত পায়ে এক রকম ফলিকুলাইটিস দেখা যায় যাকে "তৈলাক্ত ব্রণ" (oil acne) বলা হয়। ক্রমে এই স্থানগুলির হর্নি স্তর (Horny layer) মোটা হয়ে হাইপার কেরাটোসিস (Hyper Keratosis) দেখা দেয়। ক্লোরিন ঘটিত ক্লোরোন্যাপথলিন নিয়ে যাঁরা কাজ করেন তাঁদেরও এইভাবে ক্লোর-একনি হয়।

পেশাগত অপঘাত

"জাতস্য হি ধ্রুব মৃত্যু" কথাটা নতুন নয়, একজন ডাক্তারের কাছে তো নয়ই ; তবু মানুষের মৃত্যু অনেক সময় এত মহান হয়ে ওঠে যে ডাক্তারের মত মৃত্যুর সঙ্গে বহু পরিচিত ব্যক্তিরাও বিচলিত হয়ে পড়েন। ডাঃ মানস রায়-চৌধুরী উদিয়মান শল্যচিকিৎসক, জনৈক মেনিনজাইটিস রোগীর প্রাণ বাঁচাবার জন্য ব্রঙ্কোস্কোপি করতে গিয়ে তার থেকে ইনফেকটেড্ হয়ে মারা গেলেন, বা ধরুন স্পেস ক্যাপসুলের অক্সিজেন সরবরাহ ব্যবস্থায় ত্রুটি থাকার ফলে এই সেদিন তিনজন রাশিয়ান মহাকাশচারীর জীবনান্ত হল ; এ সব মৃত্যু বিশেষ ভাবে মর্মন্তুদ কারণ এঁরা মানুষের মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। সব পেশাগত মৃত্যুই এই পর্য্যায়ে পড়ে কারণ একজনের পেশায় কত লোকের উপকার হয় ! খবরের কাগজ খুললে প্রায় প্রতিদিনই এ জাতীয় কিছু না কিছু মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায়, কত মৃত্যুর কথা আমরা আবার জানতেও পারি না।

কিন্তু মরার বাড়া গাল নেই, সুতরাং মৃত্যুর কথা থাক। শারীরিক আঘাতও মানুষের প্রাচীনতম বৃত্তিজ আর্তি। এগুলি সব সময় হয়ত ব্যাধির পর্য্যায় পড়ে না, দু-এক ক্ষেত্রে এদের অভিজ্ঞতার দ্যোতক হিসাবেই গণ্য করা হয়। যেমন, "কাজ করতে করতে হাতে কড়া পড়ে গেল" কথাটা আমরা বেশ গর্বের সঙ্গেই ব্যবহার করে থাকি, যদিও কড়া বা কর্ণ্ নিশ্চয়ই শরীরের স্বাভাবিক অঙ্গ নয় বা পেশাগত বার্স'াইটিস (১নং তালিকা দ্রষ্টব্য) নিয়ে অনেকে স্বচ্ছন্দে ঘোরা ফেরা করেন। তবে এমন কতগুলি পেশাগত অপঘাত আছে যা কেবল রোগী এবং ডাক্তারকেই যে ভাবিয়ে তোলে তা নয়, এদের জন্য "শ্রম দিবস" নষ্ট হওয়াতে দেশের অর্থনীতিরও প্রচুর ক্ষতি হয়। পরিসংখ্যানের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে পেশাগত অপঘাত প্রধানত নির্ভর করে কাজের সময়, উৎপাদনের তাড়া এবং কর্মস্থলের ভৌত পরিবেশের ওপর। তাছা শ্রমিকদের ব্যক্তিগত শারীরিক ও মানসিক অবস্থা (একাদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) এবং অভিজ্ঞতা তো আছেই। ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে "Fools rush in where angels fear to tread", অনভিজ্ঞ, অপরিণত

মস্তিষ্ক কর্মী অনেক সময় এমন কাজকাণ্ড করে অপঘাত ঘটায় যা একজন বয়স্ক ব্যক্তি সচরাচর করে না। সাধারণত যে সব ক্ষেত্রে সাময়িক ভাবে শ্রমিকদের কার্য্যক্ষমতা নষ্ট হয় বা তাদের জীবন সংশয়ও দেখা দিতে পারে, তাদের সম্বন্ধে কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

পতন জনিত অপঘাত—এ জাতীয় আঘাত দুরকমে ঘটতে পারে। হয় কাজ করতে করতে রাজমিস্ত্রী বা ওই জাতীয় পেশায় যাদের উঁচুতে কাজ করা প্রয়োজন হয় তাঁরা ওপর থেকে পড়ে যেতে পারেন বা সমতল ভূমিতে কাজ করার সময়ও হোঁচট খেয়ে বা পা পিছলিয়ে গুরুতর পতন সম্ভব। সুতরাং মেঝেতে জিনিস পত্র ছড়িয়ে রাখা বা মবিল, গ্রিজ্ জাতীয় পিচ্ছিল বস্তু ফেলে রাখা উচিৎ নয়। শ্রমিকরা আর একভাবে আহত হতে পারেন, সেটা হল কর্মস্থলের ছাদ বা দেওয়াল ধ্বসে অথবা কোন গুরুভার বস্তু শ্রমিকের ওপর পড়ে। ছাদ বা দেওয়াল ধ্বসে খনি এবং দমকল কর্মীরা আহত হন বেশী আর দ্বিতীয় রকমের আঘাত আসে সাধারণতঃ ক্রেন ছিঁড়ে। এ জাতীয় আঘাতের সম্ভাবনা থাকলে সেই সব পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের শিরস্ত্রাণ এবং ইস্পাতের জুতা (Steel tipped Shoe) ব্যবহার করার উপদেশ দেওয়া উচিৎ।

পোড়া—ইঞ্জিন ড্রাইভার, দমকল বা বারুদ কারখানার শ্রমিক, পাচক ইত্যাদি উপজীবীদের অগ্নিদগ্ধ হওয়া একটি পরিচিত ঘটনা। অবশ্য শ্রমিকরা যে কেবল আগুনেই পুড়ে যান তা নয়, গলিত ধাতুর সংস্পর্শে বা উত্তপ্ত বস্তুর ছোঁয়াতেও তাঁরা দগ্ধ হতে পারেন। এ ছাড়াও বিচ্ছুরিত তাপে যে শারীরিক ক্ষতি হয় তৃতীয় পরিচ্ছেদে তার আলোচনা করা হয়েছে। জামা কাপড়ে হঠাৎ আগুন লেগে গেলে কী করা উচিৎ, কী করে নিজেকে এবং অপরকে বাঁচাতে হয় সে সম্বন্ধে মোটামুটি একটা জ্ঞানও অনেকের আছে। তবে দুর্ভাগ্য এই, যে সব কলকারখানায় হঠাৎ আগুন লাগার সম্ভাবনা, আইনে বলে সেখানকার আগুন আয়ত্বে আনতে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র রাখাটা আবশ্যিক, তা সত্ত্বেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তা থাকে না বা থাকলেও অকেজো হয়ে পড়ে থাকে।

যাই হোক, অগ্নি দহন ছাড়াও যাঁরা এসিড ইত্যাদি রসায়ন বা বিদ্যুৎ নিয়ে কাজ করেন, কাজ করার সময় তাঁদের রাসায়নিক বা বিদ্যুৎ দহন ঘটতে

পারে এবং এ জাতীয় দহনের সমস্যা তাপদহনের চেয়ে কিছুটা অন্যরকম। রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে বিশুদ্ধ এসিড (সালফিউরিক, হাইড্রোক্লোরিক নাইট্রিক ইত্যাদি) বা অ্যালকালি (যথা চুন ইত্যাদি) লেগে পুড়ে যাওয়ার কথা আমরা মাঝে মধ্যেই শুনতে পাই। কিন্তু অ্যামোনিয়া, ফেনল (কার্বলিক এসিড), করোসিভ্ সাবলিমেট, সিলভার নাইট্রেট ইত্যাদি উগ্র রসায়ন লেগে কত বিজ্ঞানী বা শ্রমিক আহত হয়ে থাকেন তার খবর রাখে কজন ? তাপ-দহনের মতই এসব ক্ষেত্রেও শরীরের কতটা অংশ পুড়ল, ক্ষত কত গভীর, রোগীর বয়স ইত্যাদির ওপর পুড়ে যাওয়ার গুরুত্ব নির্ভর করে। মুখ চোখের দহন সারাজীবনের মত শ্রমিককে পঙ্গু করে দিতে পারে। রাসায়নিক দহন হলেই সঙ্গে সঙ্গে ক্ষত স্থান পরিষ্কার জলে ধুয়ে ফেলা উচিৎ, যা তাপদহনে কদাপি করা উচিৎ নয়। বিদ্যুৎ দহন আরও মারাত্মক হয়, কারণ এ সব দহনে যতটা পরিমাণ স্থান পুড়ে গেছে বলে মনে হয় তার চেয়ে অনেক বেশী স্থানের শরীর কলা ধ্বংস হয়ে থাকে, ঘা গুলিও সারতে অনেক সময় নেয়। তড়িৎ প্রবাহে অন্য ক্ষয়ক্ষতিগুলি তৃতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

মেশিনের আঘাত—কলকারখানার শ্রমিকদের মধ্যে সাধারনত দুরকম মেশিনের আঘাত দেখতে পাওয়া যায় (ক) কাটা ছেঁড়া ও (খ) থেঁতলে যাওয়া বা ক্রাশ ইনজুরী। প্রথম জাতীয় আঘাত দেখতে পাওয়া যায় কসাই, কাঠ চেরাই ইত্যাদি পেশায় যাঁরা ধারাল যন্ত্র নিয়ে কাজ করেন তাঁদের মধ্যে, এবং দ্বিতীয় রকম আঘাতের জন্য দায়ী ফ্যানবেল্ট, রোলার মেশিন বা প্রেসে হাত ঢুকে যাওয়া। এ সব আঘাত শরীরের যে কোন স্থানেই আসতে পারে তবে সাধারণত দেখা যায় হাতে আঘাতের সংখ্যাই বেশী। যে সব পেশায় কাচ নিয়ে কাজ করতে হয়, অসাবধান হলে তাঁদের হাতের চামড়া বা আরও গভীরে কণ্ডরা (Tendon), ধমনী ও শিরা উপশিরা এবং স্নায়ু কেটে যাওয়া বা ধারাল মেশিনে আঙ্গুলের ডগায় চোকলা উঠে হাড় বেরিয়ে পড়া (Slicing injury) প্রায়ই দেখা যায়।

শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের মধ্যে পুড়ে যাওয়া বা মেশিনের আঘাত এত বেড়ে গেছে যে নানারকম আইন কানুন করে এগুলি প্রতিরোধের ব্যবস্থা হয়েছে বা হচ্ছে। যেমন, শ্রমিকদের শারীরিক নিরাপত্তার জন্য আমাদের দেশের ফ্যাক্টরী আইন (১৯৪৮)-এর 21নং ধারায় মেশিনের যে সব অংশের

দ্বারা শ্রমিক আহত হতে পারেন তাদের সম্বন্ধে বক্তব্য "...Shall be securly fenced by safe gaurds of substantial construction which shall be kept in position while the part of the machinary they are fencing are in motion or in use" (যখন সেগুলি চলছে বা ব্যবহৃত হচ্ছে তখন সেগুলিকে ভালভাবে নিরাপত্তার উপায় দিয়ে নিরাপদভাবে ঘিরে রাখতে হবে) এইভাবে 22 এবং 24-40নং ধারাতে তাপদহন, ক্রেন ছিঁড়ে পড়া ইত্যাদির সম্বন্ধে আরও কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের দেশে এই সব নির্দেশাদি অর্থনৈতিক কারণে এবং/ বা শ্রমিকদের অজ্ঞতা ও মালিকদের অসাধুতার জন্য বহু ক্ষেত্রে মানবার বা মানাবার চেষ্টা দেখা যায় না। তার ওপর শত সাবধানতা সত্ত্বেও অপঘাত ঘটে এবং হামেশাই ঘটে থাকে।

তবে একটা কথা, শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে অপঘাতের সংখ্যা কমাতে হলে আইনকানুনের চেয়েও বড় দরকার তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং অপঘাতের কারণ সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা। এটা একটা সামাজিক দায়িত্ব। এর জন্য অডিও-ভিসুয়াল (audio visual) বক্তৃতা, পোস্টার ইত্যাদির বন্দোবস্ত করা দরকার। বিভিন্ন শ্রমিক সংস্থা ও সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে এসব ব্যাপারে অগ্রণী হতে হবে।

সভ্য দেশে আহত শ্রমিকদের চিকিৎসারও সুবন্দোবস্ত থাকা উচিৎ। চিকিৎসা আবার চারটি স্তরে বিভক্ত। প্রথমেই অকুস্থলে যাঁরা থাকেন তাঁদের কিছু কিছু প্রাথমিক চিকিৎসা জেনে রাখা উচিত। যেমন সহকর্মীর জামা কাপড়ে আগুন লাগলে পারদপক্ষে জল দিয়ে আগুন নেভাবার চেষ্টা করা উচিৎ নয়, দহনকারী রাসায়নিক লাগলে জায়গাটা সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে ফেলা উচিৎ, মেরুদণ্ডে আঘাত সন্দেহ হলে রোগীকে কখনই চিৎ করে শোয়াবার চেষ্টা করা উচিৎ নয়, রোগীর চার পাশে ভিড় করে বায়ু চলাচল রোধ করা উচিৎ নয় ইত্যাদি। এর সঙ্গে কৃত্রিম শ্বাসকার্যের (artificial respiration) নিয়ম কানুন জেনে রাখাও ভাল। চিকিৎসার দ্বিতীয় স্তরে কর্মস্থলের অন্তত দু' তিনশ গজের মধ্যে সুসজ্জিত প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র এবং অ্যামবুলেন্সের বন্দোবস্ত থাকা দরকার। এঁদের প্রধান কাজ রোগীর উপকার করতে পারুন না পারুন, অপকার না করে নিরাপদে

আহত ব্যক্তিকে বড় হাসপাতালে পাঠাবার বন্দোবস্ত করা। এই সব হাসপাতালেই তৃতীয় পর্য্যায়ের চিকিৎসা শুরু হয়। চতুর্থ স্তরে আঘাতের গুরুত্ব ও ভবিষ্যৎ ভেবে রোগীকে যথা সময়ে বিশেষজ্ঞদের হাসপাতালে (referal hospital) পাঠান কর্তব্য। এই সব বড় বড় হাসপাতালে আজকাল অস্থি বিশারদ, প্লাস্টিক সার্জেন ইত্যাদি বিশেষজ্ঞরা আহতের চিকিৎসায় অবিশ্বাস্য পারদর্শিতা দেখাচ্ছেন। যেহেতু শিল্পে হাতের আঘাতের সংখ্যাই সর্বাধিক তাই আজকাল হাতের শল্য চিকিৎসা (hand surgery) একটা আলাদা পাঠ্য বিষয় হিসাবে গণ্য হচ্ছে। তা ছাড়া মাইক্রোভাসকুলার শল্য চিকিৎসার দৌলতে শ্রমিকের ভবিষ্যৎ আর অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়।

অস্ত্রাঘাত—কর্মক্ষেত্রে আহত হওয়াটা সামরিক বা আধা সামরিক পেশার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শেলের আঘাত বা বোমা, গ্রেনেড ইত্যাদি ফেটে ব্লাস্ট ইনজুরি খুবই মারাত্মক হতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রান্না ঘরের গ্যাস সিলিনডার ফেটে এ জাতীয় ব্লাস্ট ইনজুরি অনেক গৃহবধুর প্রাণহানী ঘটিয়েছে। তা ছাড়া খনিমধ্যে মাঝে মাঝে বিস্ফোরণ ঘটে থাকে এবং লোহার কারখানায় গলিত লোহা পাত্রে ঢালবার সময় পাত্র যদি সম্পূর্ণ শুষ্ক না হয় তা হলেও বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।

কৃষিসংক্রান্ত পেশায় অপঘাত—১৯৬৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্রেফ পেশার জন্য আহত হয়েছিলেন 76,000 জন খামার শ্রমিক এবং মৃতের সংখ্যা ছিল 8300। ভারতে এ জাতীয় পরিসংখ্যান করা হয় বলে জানা নেই। বস্তুত আমরা মুখে বলি বটে ভারত কৃষি প্রধান দেশ, কিন্তু এদেশেই কৃষক স্বাস্থ্য বোধ হয় সর্বাধিক অবহেলিত। মারাত্মক অপঘাতের কথা ছেড়ে দিলেও সামান্য একটা কাটা ছেঁড়ার চিকিৎসায় সময়মত একটা টেটেনাস প্রধিরোধক ইনজেকশনও তাঁরা পান কি না সন্দেহ। অথচ যে কোন ডাক্তারই বলবেন ধনীর ঘরের দুলাল পেন্সিল কাটতে গিয়ে আঙুল কেটে ফেললে তার এই ইনজেকশনের যা প্রয়োজন, এক জন চাষীর তার চেয়ে অনেক বেশী, কারণ খেত খামারের কাজে টিটেনাসের সম্ভবনা অনেক বেশী এবং কাস্তে কোদাল লাঙ্গল ইত্যাদি ধারাল যন্ত্র এঁদের পেশার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

চাষীদের মধ্যে আর এক রকম অপঘাত প্রায়ই দেখা যায়, দুষ্টু গোরুর পদাঘাত বা শিং-এর গুঁতো। এ সব আঘাত খুবই মারাত্মক হতে পারে কিন্তু

চিকিৎসার জন্য রোগীকে বেশ কয়েক মাইল গোরুর গাড়ী বা দোলায় চেপে সদর হাসপাতালে পৌঁছতে হয় ; এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে। চাষীদের শারীরিক আর্তি প্রতিরোধ কল্পে সভ্যদেশগুলিতে বেশ কড়া আইন বলবৎ আছে। বিলেতে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে চাষীদের ফ্যাক্টরি আইনের আওতায় আনার পর থেকে পর পর আরও আইন পাশ হয়েছে তাদের কল্যাণে, ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মাড়াই কলের আঘাত, ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তুষ ঝাড়াই মেশিনের আঘাত, ১৯৫২ সালে Agricultural (poisonous substances) act, ১৯৫৬ সালে Agriculture (Safety, health and welfare provision) act ইত্যাদি।

খনি শ্রমিকদের অপঘাতের কারণ যাই হোক, বরঞ্চ আমাদের দেশে এঁদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছু ভাবনা চিন্তা হয়েছে বা হচ্ছে। খনিতে ধ্বস নামা, কর্মরত শ্রমিকদের জলবন্দী হওয়া ইত্যাদি অপঘাতের কথা আমরা প্রায়ই শুনতে পাই। সার হামফ্রে ডেভির কৃপায় অবশ্য খনি অভ্যন্তরে বিস্ফোরণের সংখ্যা আজকাল অনেক কমে গেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কয়লার গুড়োর সঙ্গে পাথরের গুড়ো 3:2 অনুপাতে মিশিয়ে খনি অভ্যন্তরে ছড়িয়ে দিয়ে দেখা গেছে বিস্ফোরণের সংখ্যা অনেক আয়ত্বে আনা যায়।

পশু সংক্রান্ত পেশায় অপঘাত—পল্লী অঞ্চলে তো বটেই এমন কি খাস কোলকাতার মত শহরে আইন কানুন উপেক্ষা করে ফালাও খাটালের ব্যবসা চলছে এবং বহু লোক এতে নিযুক্ত। রাস্তা ঘাটেও গোরু মোষের দৌরাত্ম, তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বঙ্গজের অর্থাৎ নেড়ি কুকুরের সংখ্যা অজস্র। শোনা যায় (বড় একটা দেখা যায় না) এদের যাথাযথ ব্যবস্থা করবার জন্য কলকাতা কর্পোরেশনের একটা ডেনজারাস অ্যানিম্যাল স্কোয়াডও নাকি আছে। এই সব বেওয়ারিশ কুকুরের কামড়ে বা গোরু মোষের দৌরাত্মে জন সাধারণ এবং উপরিউক্ত উপজীবীরা সবাই আহত হতে পারেন। সব সময় জলাতঙ্ক বা টেটেনাস পর্য্যন্ত ব্যাপারটা না গড়ালেও এই সব আঘাত জনিত ক্ষত সারতে বহু সময় নেয়। এইসব বহু পরিচিত পশু সংক্রান্ত অপঘাতের কথা বাদ দিলে বন্যপ্রাণী সংরক্ষক, পশু ধরা ও বিক্রয় করার ব্যবসায়ে লিপ্ত ব্যক্তি, পশু চিকিৎসক, এঁরাও এক সময় না এক সময় পশুদের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেন। তা ছাড়া ধীবর বা নুলিয়ারা মধ্যে মধ্যে হাঙর, ব্যারাকুদা ইত্যাদি

হিংস্র জলচরপ্রাণীর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন এ খবর পাওয়া যায় ; এবং গভীর সমুদ্রের ডুবুরী বা মুক্তা সংগ্রহকারীরাও এ জাতীয় বিপদে পড়তে পারেন। এই সূত্রে একটা কথা বলা দরকার, সুন্দর বনে মধু এবং কাঠ সংগ্রহকারীরা কত জন যে বাঘ বা কুমিরের পেটে গেছেন বা সাপের বিষে মারা গেছেন তার ইয়ত্তা নেই।

যে কোন পেশাগত অপঘাতের ফলে শ্রমিকের অঙ্গহানী বা মৃত্যু ঘটলে টাকা দিয়ে ক্ষতিপূরণ করা যায় না ঠিকই কিন্তু সব সভ্য দেশেই তার আর্থিক ক্ষতি পুষিয়ে দেবার বন্দোবস্ত আছে। ছোট খাট আঘাতে শ্রমিকদের সবেতন "মেডিক্যাল লিভ" দেওয়া হয়। আঘাতের ফলে সারাজীবনের মত যদি পূর্ণ বা আংশিক ভাবে শ্রমিক কার্য্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন তা হলে মালিকপক্ষ তাঁকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য এবং পরিমাণ নির্ভর করে শ্রমিকের অবশিষ্ট কর্মজীবন কতটা এবং তাঁর বেতনের ওপর। ভারতে "The Workmans Compensation Act (1923)" এবং ১৯৬২ সালে তার সংশোধনীতে দুটি হাত, দুটি পা, একটি হাত ও একটি পা নষ্ট হলে, দৃষ্টি শক্তি বা শ্রবণ শক্তির পূর্ণ অবক্ষয় ঘটলে শ্রমিককে সারা জীবনের মত পঙ্গু বলে গণ্য করা হয়। এই ভাবে আংশিক প্রতিবন্ধীত্বেরও তালিকা দেওয়া হয়েছে। আংশিক প্রতিবন্ধীদের অবশ্য বিকল্প চাকরীও দেওয়া হয়। আমাদের দেশে কিন্তু বহু শ্রমিকই ফাঁকি পড়েন বিভিন্ন কারণে।

পেশাগত ইনফেকশন

প্রাগৈতিহাসিক আমল থেকেই মানুষের পেশা সমবায় ভিত্তিক। লক্ষাধিক বছর আগে যখন শিকারই ছিল তাদের একমাত্র উপজীবিকা, তখনও যেমন তারা দল বেঁধে শিকার করত, আজও তেমনি বেশীর ভাগ পেশাতেই তারা দল বেঁধে কাজ করে, ফলে সহকর্মীদের কাছ থেকে কেবল সহযোগিতাই নয়, তারা কিছু ব্যাধিও সংগ্রহ করে, যেমন বেশ কিছুদিন আগে কাচ শিল্পে একই ব্লো পাইপ (ফুঁ দেওয়ার নল) নিয়ে একাধিক ব্যক্তি কাজ করত বলে ওষ্ঠে সিফিলিস জনিত ক্ষত অনেকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ত। তাছাড়া ইনফ্লুয়েঞ্জা বা কনজাংটিভাইটিস (জয় বাংলা ?) প্রভৃতি ভাইরাস জনিত রোগ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আমদানি হয় কর্মস্থল থেকে। সুতরাং এগুলিকে ঠিক পেশাগত ব্যাধি না বলে সামাজিক ব্যাধিই বলা উচিৎ। তবে ইনফেকশনের দরুণ মানুষের এমন কিছু রোগ হয় যাদের প্রত্যক্ষভাবে পেশার সঙ্গে যুক্ত করা যায়। বস্তুত চাষ আবাদ, খনির কাজ, পশুপালন অথবা ডাক্তার, নার্স, ল্যাবরেটরি কর্মী, ভেটানারি ডাক্তার (পশু চিকিৎসক) ইত্যাদি বহু পেশাতেই ক্রশ ইনফেকশন, অর্থাৎ ব্যক্তি বা পশু বিশেষের দেহ থেকে অন্য দেহে রোগ সংক্রমণ খুবই সাধারণ ঘটনা।

(ক) চাষ আবাদ সংশ্লিষ্ট ইনফেকশন

এই পেশায়, বিশেষ করে আমাদের দেশে, কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষনীয়। প্রথমতঃ এদেশে চাষীদের আর্থিক অবস্থা সাধারণত খারাপই হয়ে থাকে ; তার ওপর আছে এদের নিরক্ষরতা প্রসূত অজ্ঞতা ও কুসংস্কার। প্রধানত এই দুটি কারণে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এঁরা প্রায়শই উদাসীন হয়ে থাকেন। তারপর লক্ষনীয় এঁদের কর্ম পরিস্থিতি। অন্যান্য দেশের মত আমাদের চাষ পদ্ধতি অতটা যন্ত্র নির্ভর নয়, তাই রোদে জলে কটিবাস মাত্র সম্বল করে এঁরা দিনের পর দিন মাঠে ঘাটে কাজ করতে বাধ্য হন। যার ফলে এঁদের শরীরে বিশেষ

কয়েকটি রোগ দেখা যায়। এই সব রোগের কারণ প্রধানত পরজীবী ও ছত্রাকের আক্রমণ।

আমাদের দেশে চাষীদের মধ্যে হুক ওয়ার্ম (Hook worm) ইনফেকশন প্রায়ই দেখা যায়। এই কৃমি সাধারণত দ্বিবিধ ঃ অ্যাঙ্কাইলো-স্টোমা ডিওডিনেল (Ankylostoma Duodenale) এবং নেকেটর আমেরিকানিস (Necator Americanis অর্থাৎ আমেরিকার খুনী)। নাম থেকেই বোঝা যায় দ্বিতীয়টির প্রাদুর্ভাব আমেরিকার চাষীদের মধ্যেই বেশী। পূর্ণাঙ্গ কৃমিগুলি সাধারণত 1 সে.মি, লম্বা হয়ে থাকে, মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রের উপরিভাগে এরা বাসা বাঁধে এবং এদের বৈশিষ্ট্য হল—মুখগহ্বরের দাঁত দিয়ে (যার থেকে এদের নাম হয়েছে অ্যাঙ্কাইলোস্টোমা) অন্ত্রের ঝিল্লি কামড়ে ধরে থাকে এবং সেখান থেকে রক্ত শোষণ করে। একটি পূর্ণবয়স্ক কৃমি সাধারণত দৈনিক ·03 থেকে 0·1 সিসি রক্ত শোষণ করতে পারে। স্ত্রী কৃমিরা ডিম পাড়লে আক্রান্ত ব্যক্তির মলের সঙ্গে সেগুলি বেরিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। কেবল মাত্র উষ্ণ, ভিজে মাটিতেই (60° ফারেনহাইট) দিন পাঁচেকের মধ্যে ডিম ফুটে শূককীট বা লার্ভা বেরিয়ে আসে। ঠিক এই কারণেই আমাদের দেশের ক্ষেতের জমিতে বা ঠাণ্ডা দেশের খনি অভ্যন্তরের উষ্ণতায় হুক ওয়ার্মের শূককীট দেখা যায়। এর পর শূককীটগুলি চাষীদের পা অথবা খনি শ্রমিকদের হাতের নগ্ন চর্মের সংস্পর্শে এসে সেখানে চুলকানি বা ফোঁড়া সৃষ্টি করে। বিভিন্ন সময়ে এ জাতীয় চর্ম রোগকে কুলির চুলকানি (Coolies Itch), জল ফোস্কা, মাটি বা জলের চুলকানি (মাইনারস বাঞ্চ, Miners Bunch) ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়ে আসছে। যাই হোক, অতঃপর শূককীটগুলি চর্ম ভেদ করে শিরার রক্তের দ্বারা বাহিত হয়ে অলিন্দে গিয়ে পৌছায় এবং সেখান থেকে অনুপ্রবেশ করে ফুসফুসে। তারপর কফের সঙ্গে মুখগহ্বরে এসে ভুক্ত হয়ে অন্ত্রে প্রবেশ ক'রে সেখানেই বাসা বাঁধে। কৃমির সংখ্যা পাঁচশোর উর্দ্ধে হলে তবেই আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে ছ'মাসের মধ্যে রোগের উপসর্গ প্রকট হয়। চর্ম সংক্রান্ত উপসর্গ ছাড়া রোগীদের শ্বাসকষ্ট, দুর্বলতা পেটে অস্বস্তি দেখা দেয় এবং ক্রমশ রক্তাল্পতার ফলে রোগী এত ক্যাকাশে হয়ে যায় যে তার জিভটি প্রায় ব্লটিং পেপারের মত দেখতে হয় (ব্লটিং পেপার টাঙ)। রক্তক্ষরণের জন্যই এই রক্তাল্পতা, সুতরাং এটি লৌহ ঘাটতি জনিত অ্যানিমিয়ার অনুরূপ, তার ওপর

চাষীভাইদের খাদ্যতালিকায় শাকসব্জীর পরিমাণ বেশী বলে আহার্য্যের সঙ্গে তাঁরা যে লৌহ গ্রহণ করেন তা ফাইটিক এসিড (Phytic acid) এর সঙ্গে মিশে যে যৌগ তৈরী করে সেটি শরীরের পক্ষে গ্রহণ যোগ্য নয়। তা সত্ত্বেও দেখা গেছে এই সব রোগীকে কেবল মাত্র গ্রহণযোগ্য লৌহ (অ্যাবসরবেবল আয়রন) দিয়ে চিকিৎসা করলেই উপকার পাওয়া যায় না, খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণও বাড়ান দরকার। এই কৃমির চিকিৎসায় বেফোনিয়াম হ্যাপথোয়েট বা অ্যালকোপার ওষুধটি খুবই কার্য্যকরী।

চাষ আবাদের পেশায় ভূমিই হ'ল লক্ষ্মী। কিন্তু মাটিতে বহুজাতীয় ক্ষতি কারক ছত্রাক মিশে থাকে যার ফলে চাষীরা দাদ, ছুলি ইত্যাদি ছত্রাক জনিত চর্মরোগে প্রায়ই আক্রান্ত হন। তা ছাড়াও স্পোরোট্রাইকোসিস্ (Sporotricosis), ব্লাসটোমাইকোসিস্ (Blastomycosis), টরুলোসিস্ (Torulosis) ইত্যাদি ছত্রাক জনিত রোগও তাঁদের হতে পারে। দক্ষিণ ভারতের মাদুরায় চাষীদের শরীরে, বিশেষ করে পায়ের চর্মে এক বিশেষ ধরণের ছত্রাক ইনফেকশন দেখা যায় যার নামই দেওয়া হয়েছে "মাদুরা ফুট্"। এটি অ্যাকটিনোমাইকোসিস্ জাতীয় ছত্রাক। এর আক্রমণে চর্মে যে বহু মুখী শোথ হয় তার থেকে গুঁড়ো পদার্থ (সালফার গ্র্যানুলস) আকারে ছত্রাকগুলি নির্গত হতে থাকে।

আমাদের দেশের চাষীদের পায়ের আঙ্গুলে আয়েনহুম (Ainhum) নামে এক ব্যাধি দেখা যায়। অনেকে অনুমান করেন এটি এক বিশেষ ধরনের ছত্রাকের ইনফেকশনের ফল। রোগটির লক্ষণ হল আঙ্গুলের মূলে আঙটির আকারে তন্তুকলা (ফাইব্রাস টিস্যু) বৃদ্ধি পায়, যার ফলে ক্রমশ অঙ্গুলি বিশেষে রক্ত চলাচল কমে আসতে থাকে এবং শেষ পর্য্যন্ত আঙ্গুলটি খসে পড়ে। গোলাজাত শস্যদানায় অ্যাসপারগুলাস্ (Aspargulas) নামে এক ছত্রাক জন্মায় এবং এরাও চাষীদের আক্রমণ করে। তবে অনেকে এটিকে পেশাগত ব্যাধি বলতে নারাজ। জল জমা ধানজমিতে নগ্নপদে কাজ করলে অনেক সময় চাষীদের পায়ের চামড়ায় স্ট্রেপটো অথবা স্ট্যাফাইলো কক্কাস (Strepto, Staphylo coccus) জীবাণুর আক্রমণে ফলিকুলাইটিস্ (follicu-litis) হয়।

(খ) পশুপালন পেশায় ইনফেকশন

মানুষ যতদিন চাষ আবাদ শিখেছে প্রায় ততদিন ধরেই, অথবা তার আগে থেকেই পশুপালন করছে। পুরাতাত্ত্বিকেরা বলেন মানুষ সর্বপ্রথম বন্য কুকুরকেই গৃহে পালন করেছিল ; আজও বহু ব্যক্তি কুকুর বেচাকেনার কাজে লিপ্ত আছেন। সুতরাং আমরাও এই পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের বিশেষ ধরণের ইনফেকশনের আলোচনা দিয়ে শুরু করি। কুকুরের সংস্পর্শে যে সব ব্যাধি হয় তার মধ্যে একাইনোকক্কাস গ্র্যানুলোসাস (Echinococcus Granulosus) নামে একরকম ফিতাকৃমির আক্রমণই সর্বপ্রধান। কৃমির শূককীটগুলি সিস্‌ট্ (cyst) আকারে মানুষ, ভেড়া, শূকর প্রভৃতি অন্তবর্তী আশ্রয়দাতার (Intermidiate Host) যকৃৎ, পেশী ইত্যাদি স্থানে বাসা বাঁধে। কুকুরেরা এই সব সিসট্ আক্রান্ত মাংস খেলে তাদের অন্ত্রে শূককীটগুলি 5 মিমি আন্দাজ লম্বা, 4 টুকরায় বিভক্ত পূর্ণাঙ্গ কৃমিতে রূপান্তরিত হয় এবং 30-50টি হুক্ এবং চারটি চোষক যন্ত্র দিয়ে অন্ত্রের ঝিল্লি আঁকড়ে থাকে। এদের পুচ্ছদেশীয় টুকরাটির মধ্যে ডিম তৈরী হয়ে কুকুরের মলের সঙ্গে বেরিয়ে আসে। কুকুরের ব্যবসায় লিপ্ত ব্যক্তিদের খাদ্যাদির সঙ্গে এই ডিমগুলি পাকস্থলীতে যাবার সম্ভবনা। সেখানে ডিম ফুটে শূককীট বের হয় এবং সেগুলি মুখের ছটি দাঁত দিয়ে পাকস্থলীর ঝিল্লি ভেদ করে পোর্টাল (Portal) রক্তের সঙ্গে যকৃতে উপস্থিত হয়ে সেখানে সিস্‌ট্ আকারে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

কুকুরের কামড়ে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়, সাধারণতঃ সেগুলি নিরাময় হতে বহু সময় লাগে তো বটেই, তা ছাড়াও কুকুরের কামড়ে মারাত্মক জলাতঙ্ক রোগ হতে পারে। কুকুরের কামড়ে যে ধনুষ্টঙ্কার (টিটেনাস) হয় তার কারণ পাস্টুরেলা সেপটিকা (Pastourella Septic) এবং হিমোফিলাস্ ব্রঙ্কোসেপ্টিকাস (Haemophilus Bronchosepticus) নামে জীবাণুগুলি। জলাতঙ্কের কারণ অবশ্য এক জাতীয় ভাইরাস। শুধু কুকুরের কামড়েই যে জলাতঙ্ক হয় তা নয়, এমন ঘটনাও শোনা গেছে যে পশুচিকিৎসক জলাতঙ্কগ্রস্ত কুকুরের শব ব্যবচ্ছেদ করতে গিয়ে ওই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন।

তৃণভোজী পশুদের মলে ক্লসট্রিডিয়া টেটেনাই (clostridia Tetani) নামে একরকম স্পোর (spore) বিশিষ্ট ব্যাসিলাস জাতীয় জীবাণু থাকে এবং

এদের জীবন অক্সিজেন নিরপেক্ষ (anaerobes)। অপঘাত জনিত ক্ষতের সঙ্গে জীবানুগুলি শরীরে প্রবেশ করে টিটেনাস বা ধনুষ্টঙ্কার রোগ সৃষ্টি করে। মানুষ বহু শতাব্দী ধরে রোগটির সন্ধান জানে কিন্তু ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কার্ল এবং র‍্যাটন প্রথম লক্ষ্য করেন যে পশুদের সংস্পর্শেই এই মারাত্মক রোগটি দেখা যায়। রোগটির বৈশিষ্ট্য হল এই যে সাধারণ জীবানুনাশকে বা গরম জলে জীবানুটি ধ্বংস হলেও এর স্পোর নষ্ট হয় না এবং ভবিষ্যতে স্পোর থেকেই নতুন জীবানু তৈরী হয়। ১৮৮৭ খ্রীঃ রোসেনব্যাক এই স্পোরের সন্ধান পান। ধুলো, কাদা বা মাটির সঙ্গে স্পোরগুলি মিশে থাকে। শরীরে অনুপ্রবেশ করবার 24 ঘণ্টা থেকে 15 দিনের মধ্যে রোগের উপসর্গগুলি প্রকট হতে থাকে। শুরুতে নিদ্রাল্পতা, দুঃস্বপ্ন, প্রস্রাবে অসুবিধা, মাথা ঘোরা, মাথার যন্ত্রণা, খেতে কষ্ট ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়, তার পর প্রথমে মুখমণ্ডলের পেশী থেকে শুরু করে সারা শরীরের মাংস পেশীতে খিঁচুনী ছড়িয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত এর ফলে সমস্ত শরীর ধনুকের মত বেঁকে যায়। এই রোগ প্রতিরোধের প্রকৃষ্ট উপায় অতি শৈশবেই এর প্রতিশেধক টক্সয়েড ইনজেকশন নিয়ে রাখা। সাধারণত 2-3 মাস বয়সে ছ সপ্তাহ ব্যবধানে 0·5 থেকে 1 মিলিলিটার টকসয়ডের তিনটি ইনজেকশন দেওয়া হয় এবং তার পর বছর পাঁচেক বয়সে আর একটি দেওয়া হয়। এর পর যতবার পথে ঘাটে, খেলাধূলায় বা পেশায় কেটেকুটে যায়, ততবারই একটা করে টক্সয়েড নেওয়া উচিত। অবশ্য একবার নেওয়া থাকলে বছর খানেকের মধ্যে আর নিতে হয় না। রোগাক্রান্তদের চিকিৎসায় উপসর্গীয় চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে টেটেনাস বিরোধী (anti tetanus) সিরাম দিয়ে চিকিৎসা চালান দরকার।

আমাদের দেশে গরুদের প্রায়ই যক্ষা রোগে (Bovine Tuberculosis ?) আক্রান্ত হতে দেখা যায়। যক্ষা জীবানুগুলি তাদের স্তনে থাকে এবং দুধের সঙ্গে নির্গত হয়। সুতরাং গোয়ালাদের হাতে দুধ দোহনের সময় এই রোগ সংক্রামিত হয়ে সেখানে ক্ষত (Lupus Vulgaris) বা আঁচিল (warts) সৃষ্টি হতে পারে। যে সব কসাই টিবি রোগাক্রান্ত পশু নিয়ে ব্যবসা করেন তাঁদের হাতেও এ জাতীয় আঁচিল দেখা যায় (Butchers wart)। সৌভাগ্য বশতঃ আমাদের দেশের বেশীর ভাগ কসাই ছাগ অথবা ভেড়ার মাংস কাটেন এবং এই পশুদের বড় একটা যক্ষা হয় না।

ঠিক আমাদের দেশে দেখা না গেলেও অন্যান্য দেশে পশু পালনের জন্য আর যে যে ব্যাধি দেখা যায় নিচের সারণীতে তা উল্লেখ করা হল :

১৩নং তালিকা :

ব্যাধির নাম	জীবানুর নাম	সংশ্লিষ্ট পশু
গ্ল্যাণ্ডারস (Glanders)	Loefferella Mallei	অশ্ব, অশ্বতর, গাধা
দাদ	Ecothrix Trichophyta	অশ্ব, গরু, হরিণ, শূকর, কুকুর, বিড়াল
আণ্ডুলাণ্ট ফিভার (Undulant fever)	Brucella Abortus	গোরু, মোষ
	" Suis	শূকর
টুলারিমিয়া (Tularaemia)	Francisella Tulirensis	লেমিং জাতীয় ইদুর
কিউ ফিভার (Q-fever)	Coxiella Burnetti	গোরু, ভেড়া
শূকর পালনকারীর ব্যাধি (Swireherds disease)	Virus	ভেড়া, শূকর
লুপিং ব্যাধি (Louping ill)	"	" "
বিড়াল আঁচড়ে জ্বর (Cat Scratch fever)	A.F.B.*	বিড়াল
	Spirillum Minus	ইঁদুর
	Actinobacillus Muris	
সিটাকোসিস (Psittacosis)	Virus	টিয়া, তোতা জাতীয় পাখি

আমাদের দেশে বা অন্যস্থানে জলা ইদুরের মূত্রে লেপটোস্পাইরা ইকটেরোহেমরেজিকা (Leptospira Icterohaemorrhagica) নামে এক রকম জীবানু নির্গত হয় যার আক্রমণে মানুষের মারাত্মক ন্যাবা (বা জনডিস্) হতে পারে। ব্যাধিটি চাষী, ড্রেন পরিষ্কারক ইত্যাদি পেশায় দেখা যায়। স্কটল্যাণ্ডের এডিনবারো শহরের মৎস্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে রোগটি একসময় মহামারী আকারে দেখা দিয়েছিল, সেখানেও রোগ সংক্রমণের আসল কারণ ছিল ওই ইদুরের মূত্র।

* Acid Fast Bacillus.

পশু সংক্রান্ত পেশায় আর একটি ব্যাধি একসময় চিকিৎসকদের খুবই ভাবিয়ে তুলেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই ঘোড়া. গোরু, উট, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি পশুর সংস্পর্শে মানুষের অ্যানথ্রাকস্ (Anthrax) রোগ লক্ষ্য করা গেছল। আক্রান্ত পশুর রক্তের ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস (Bacillus Anthracis) তার মৃত্যুর পর একবার বাতাসের সংস্পর্শে এলেই তার থেকে স্পোর তৈরী হয় এবং সেটি বহুদিন বেঁচে থাকে। সুতরাং এই সব পশুর লোম (পশম) বা চামড়া যাঁরা ঘাঁটাঘাটি করতেন তাঁরা ওই জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হতেন। রোগটির অভিব্যক্তি দ্বিবিধ ; চর্মে এই জীবাণু গভীর এবং যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত সৃষ্টি করে এবং ফুসফুসে অনুপ্রবেশ ক'রে জ্বর, কাশি, বুকে ব্যাথা ইত্যাদি উপসর্গ সৃষ্টি করে। একসময় ব্যাধিটির নামই রাখা হয়েছিল উল সর্টারস্ ডিসিজ্ (Wool soters Disease)।

(গ) ডাক্তার ও নার্সের পেশায় ইনফেকশন

দধিচীকে যদি দেবতা বলে গণ্য করা হয় তা হলে পেশাগত ব্যাধির ইতিহাসে সপ্তম পরিচ্ছেদে উল্লিখিত ডাঃ মানস রায়চৌধুরীর মত আরও অনেক দধিচী আছেন, মানুষের কল্যাণে যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন— ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে জ্যাকোবাস কোলেৎসকা (ভিয়েনার ফোরেনসিক প্যাথলজিস্ট) ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইগনাজ সেমিলুইস (বুডাপেস্টের ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ) ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হাসপাতালের শল্য চিকিৎসক হেনরী নেলসন্ ইত্যাদি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত নামা বহু ডাক্তার এবং নার্স। এঁরা রোগীর সেবায় অনেক সময় নিজের শুভাশুভের কথা চিন্তা না করেই মারাত্মক ইনফেকশন নিয়ে কাজ করেন এবং আক্রান্তও হন। টিউবারকুলোসিস, টাইফয়েড, ডিপথিরিয়া, মেনিন-জাইটিস, সিরাম হেপাটাইটিস, গনোরিয়া, সিফিলিস ইত্যাদি বহু রোগে এইভাবে তাঁরা আক্রান্ত হতে পারেন। অবশ্য এ কথা অনস্বীকার্য্য, তাঁরা যখন রোগ চিকিৎসার পেশায় নিযুক্ত তখন তাঁদের প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত এবং স্বাস্থ্যের সাধারণ নিয়মও যথাসম্ভব মেনে চলা কর্তব্য। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত শত সাবধানতা সত্ত্বেও এজাতীয় ইনফেকশনের হাত তাঁরা সব সময় এড়াতে পারেন না।

পেশাগত ফুসফুসের ব্যাধি

(ক) নিউমোকোনিওসিস্

আজ থেকে প্রায় চারশ বছর আগেই প্যারাসেলসাস্ লক্ষ্য করেছিলেন যে ফুসফুসের ব্যাধির সঙ্গে পেশাবিশেষের গভীর সম্বন্ধ আছে (২য় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) এবং খনি শ্রমিকদের মধ্যে রোগটি প্রায়ই দেখা যেত বলে এর নামও রেখেছিলেন মাইনারস্ লাঙ্ (miners lung)। ব্যাধিটির ইতিহাস অনুধাবন করলে দেখা যায় একসময় ফুসফুসের যে কোন পেশাগত ব্যাধিকেই চিকিৎসকরা নিউমোকোনিওসিস্ (নিউমন = ফুসফুস, কোনিওস্ = ধূলি) পর্য্যায়ভুক্ত করতেন, কারণ মনে করা হত খনি ইত্যাদি যে সব স্থানে ধূলির প্রাধান্য, সেখানে কিছুদিন কাজ করলে ধূলিকণা শ্বসিত হয়ে এই ব্যাধি সৃষ্টি করে। ক্রমশ পেশাগত ফুসফুসের ব্যাধি সম্বন্ধে আমাদের ধারণাও পাল্টেছে, আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে এই ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যাও বেড়ে গেছে হু হু করে। বস্তুত নিউমোকোনিওসিস এখন এক সামাজিক ও অর্থ-নীতিক (Socio Economic) সমস্যা, কেবল চিকিৎসাশাস্ত্রেই আর এর গুরুত্ব সীমাবদ্ধ নয়। সমস্যাটি যে কত গভীর তার প্রমাণ পাওয়া যায় ব্যাধিটির সংজ্ঞায় মতানৈক্য থেকে।

গ্রেটব্রিটেনের আইনে নিউমোকোনিওসিসের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দিয়েছেন ন্যাশনাল ইনস্যুরেনস্ (ইনডাসট্রিয়াল ইনজুরিস) রেগুলেশন (1959)। এঁদের মতে নিউমোকোনিওসিস্ হল "Fibrosis of the lung due to silica dust, asbestos dust and other dusts and includes the conditions of lung known as dust reticulosis, but does not include Bysinosis." (সিলিকা, অ্যাসবেসটস্ ইত্যাদি ধূলিজনিত ফুসফুসের ফাইব্রোসিস্ ; এর মধ্যে ফুসফুসের রেটিকুলোসিস্ ব্যাধিও অন্তর্গত, কিন্তু বাইসিনোসিস্ ধর্তব্য নয়।) এখন এই "রেটিকুলোসিস" ব্যাপারটা একমাত্র ফুসফুসের একস্-রে-তেই ধরা পড়ে ; সুতরাং ব্রিটিশ আইনে কোন রোগী নিউমোকোনিওসিসে ভুগছে কিনা জানতে বুকের

একস্-রে করাটা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের দেশে কিন্তু এ ব্যাপারে সব সময় একস্-রের ওপর নির্ভর না করে রোগীর উপসর্গ এবং বিশেষজ্ঞের রোগ নির্ণয় ক্ষমতার ওপর জোর দেওয়া হয় বেশী। যদিও তার কারণ এই যে আমাদের দেশে সব সময় একস্-রের সুযোগ পাওয়া যায় না, তবু এই পন্থাই বোধ হয় শ্রেয়, কারণ টিবি, সারকয়ডোসিস্ প্রভৃতি পেশা নিরপেক্ষ ব্যাধিতে আক্রান্ত ফুসফুসের একস্-রের সঙ্গে নিউমোকোনিওসিস রোগে আক্রান্ত ফুস-ফুসের একস্-রে অনেক সময় তফাৎ করা শক্ত। ব্রিটিশ সংজ্ঞায় আরও একটি কথা লক্ষ্য করার মত, সেটি হল ফাইব্রোসিস্ (fibrosis) অর্থাৎ তন্তুকলার আধিক্য। সবজাতীয় ধূলি কণাই যে ফুসফুসে ফাইব্রোসিস্ তৈরী করে তা নয় এবং না করলেও রোগের উপসর্গ দেখা দিতে পারে। তাই আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা এই সংজ্ঞায় সন্তুষ্ট নন।

১৯৭১ সালের চতুর্থ আন্তর্জাতিক নিউমোকোনিওসিস সভায় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা (I. L. O) বলেন, নিউমোকোনিওসিস্ হল "......the accumulation of dust in lungs and tissue reactions to its presence; for the purpose of this defination dust is meant to be an aerosol compound of solid, inanimate particles." (ফুসফুসে ধূলি জমা এবং তার বিরুদ্ধে সেখানকার কোষকলার প্রতিক্রিয়া। সংজ্ঞার স্বার্থে ধূলিকণা বলতে বোঝাবে বায়ুদ্রব কঠিন জড়কণা)। তাঁরা আরও বলেন যে ব্যাধিটিকে প্রধান দু ভাগে ভাগ করা উচিৎ—যেখানে ফাইব্রোসিস্ হয় এবং যে সব ক্ষেত্রে হয় না। যাই হোক, শ্রমিক স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে ব্রিটিশ আইনে কতগুলি বিশেষ পেশা নির্দিষ্ট করা হয়েছে যাতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের নিউমো-কোনিওসিস্ হয়েছে সেটা প্রমাণ করার দায়িত্ব শ্রমিকের নয়, কিন্তু অপ্রমাণ করার দায়িত্ব নিউমোকোনিওসিস বোর্ডের এবং এই সিদ্ধান্তের ওপর শ্রমিকটির কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ, পেনশন ইত্যাদি প্রশ্ন জড়িত। এই তালিকাভুক্ত পেশায় নিযুক্ত নন এমন ব্যক্তিও নিউমোকোনিওসিস বোর্ডের দ্বারা প্রত্যায়িত হতে পারেন, যদি তাঁরা রোগ প্রমাণ করতে সক্ষম হন। আইনে নির্দিষ্ট পেশাগুলির মধ্যে কয়লাখনি শ্রমিকরাই প্রধান; তাছাড়া মৃৎশিল্পে, পাথরের কেয়ারিতে, শ্লেট পাথরের খনিতে, তাপরোধক ইটের কারখানায়, লোহার খনি ইত্যাদিতে নিযুক্ত ব্যক্তিরাও অন্তর্ভুক্ত।

লক্ষণীয়, উপরিউক্ত দুটি সংজ্ঞাতেই ধূলিকণা (dust particle) এবং বাতাসে দ্রবীভূত কঠিন জড় কণার (aerosol compound of solid inanimate particle) কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তা ছাড়াও এমন অনেক পেশা আছে যাতে তরল পদার্থ বা গ্যাসের সূক্ষ্ম কণা বাতাসের সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে মিশে শ্বাসবায়ুর মাধ্যমে নাক থেকে ফুসফুস পর্য্যন্ত শ্বাসযন্ত্রের ক্ষতি করতে পারে। অবশ্য এ ব্যাপারে প্রকৃতিদেবীর কতগুলি নিজস্ব প্রতিরোধ ব্যবস্থাও আছে। প্রথমত কণাগুলির পরিমাপ 50 মাইক্রনের বেশী হলে সেগুলি বাতাসের সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে মিশতে পারে না এবং এই সব বৃহদাকার কণার দ্বারা দূষিত বাতাস গ্রহণ করলেই হাঁচি বা কাশি আসে অথবা প্রতিবর্ত-

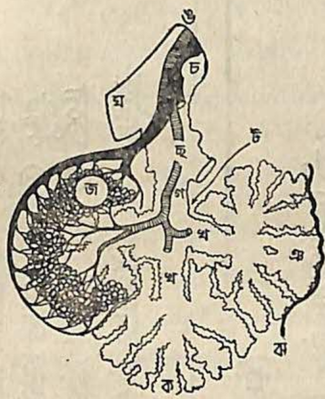
১৪নং তালিকা :

শ্বাস বায়ুতে পেশাগত দূষিত পদার্থ জনিত ফুসফুসের ব্যাধি

নিমিত্ত	আক্রান্ত শ্বাস-যন্ত্রাংশ	কি জাতীয় ক্ষতি
দ্রবণীয় প্রদাহী গ্যাস	ক্লোমনালীর উপরিভাগ	প্রদাহ
অপেক্ষাকৃত কম দ্রবণীয় গ্যাস	ক্লোমনালীর নিম্নভাগ এবং শ্বসন একক	,,
সুবেদী (sensitizing) ধাতু	ক্লোমনালী ও শাখা	ইমিউনো প্যাথলজিক্যাল বিক্রিয়া
টল্যুলিন-ডাই-আইসোসায়ানেট	,,	,,
তুলার গুঁড়া	,,	,, (সম্ভবত জীবাণুঘটিত)
তন্তুকলা উৎপাদনকারী ধূলি :		
ক) সিলিকা	,, এবং শ্বসন একক	P. M. F* ও রিউমাটয়েড ব্যাধি
খ) অ্যাসবেস্টস্	ক্লোমনালীর নিম্নভাগ এবং শ্বসন একক	,,
তেজস্ক্রিয় পদার্থের ধূলি	ক্লোমশাখা ও শ্বসন একক	ক্যান্সার
কয়েক জাতীয় কাঠের গুঁড়া	সাইনাস ও ক্লোমশাখার উপরি ভাগ	,,

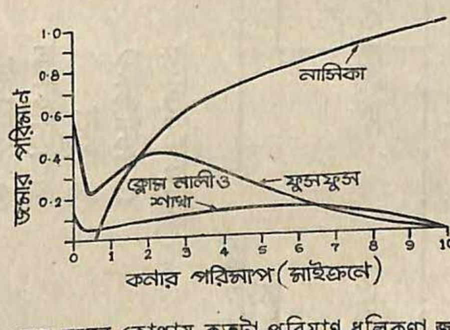
* Progressive Massive Fibrosis.

ক্রিয়ায় সাময়িকভাবে শ্বাসকার্য্য বন্ধ হয়ে যায়, ফলে সেগুলি আর শরীরে ঢুকতে পারে না। তা ছাড়া নাকের রোমেও কিছু আটকে যায়। মুশকিল

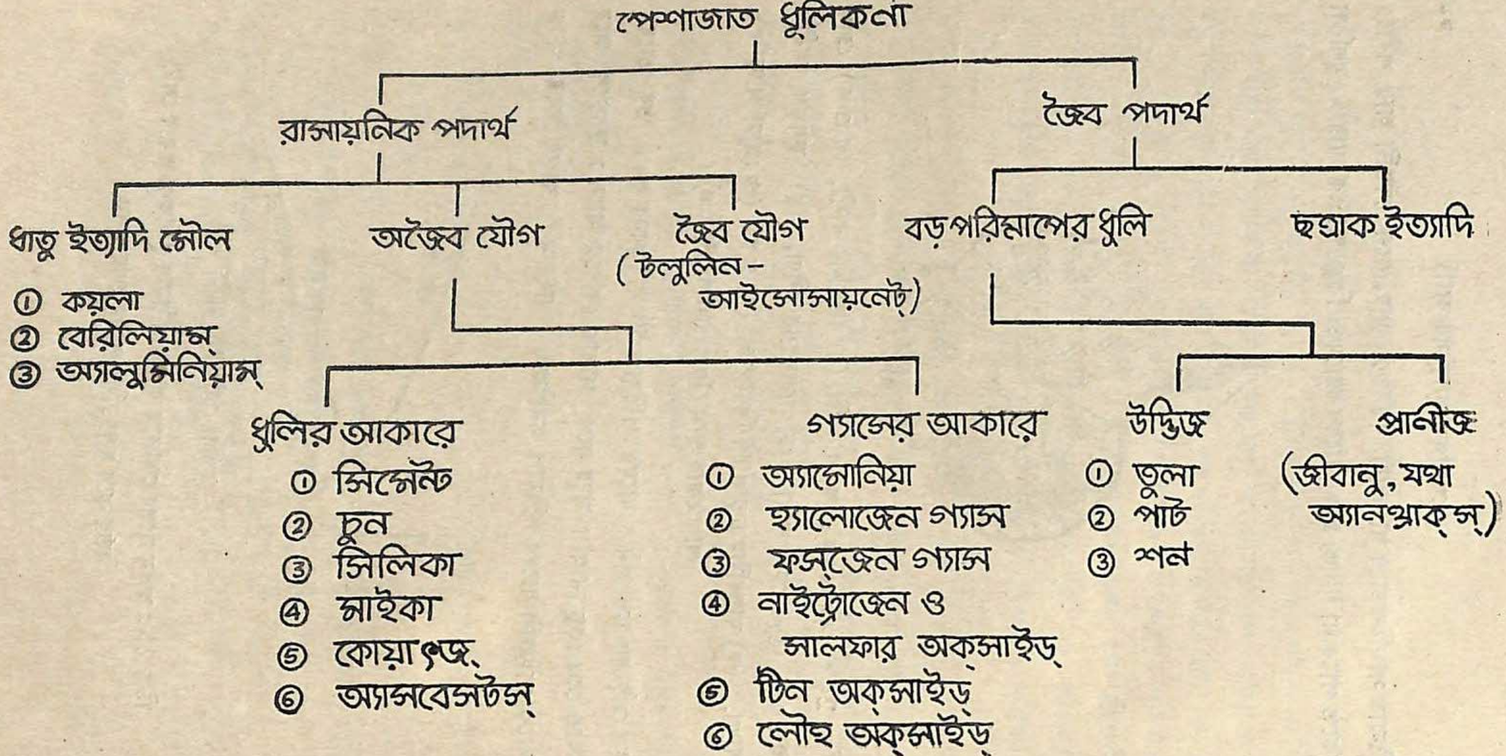


চিত্র 24 : শ্বসন একক ; (ক) বায়ুথলি, (খ) বায়ুথলির নালী, (গ ও ঘ) ক্লোম প্রশাখা, (ঙ) ক্লোম শাখা, (চ) ফুসফুসের শিরা, (ছ) ফুসফুস ধমনীর শাখা, (জ) বায়ুথলির চতুষ্পার্শে শিরাজাল (ঝ) প্লুরা, (ঞ) প্লুরা আচ্ছাদিত আন্তঃকোষ স্থান (Interstitial Space)।

হয় সেই সব কণা নিয়ে যাদের পরিমাপ 50 মাইক্রনের কম। তবু তাদের মধ্যেও বেশ কিছু নিঃশ্বাস বায়ুর সঙ্গে আবার বেরিয়ে আসে ; ফুসফুসে জমে থাকে সেইগুলি যাদের পরিমাপ অনধিক 0·1 মাইক্রন। বাস্তব ক্ষেত্রে অবশ্য



চিত্র 25 : শ্বসন যন্ত্রের কোথায় কতটা পরিমাণ ধূলিকণা জমবে সেটা নির্ভর করে কণাগুলির পরিমাপের ওপর।


পেশাজাত ধূলিকণা
রাসায়নিক পদার্থ
জৈব পদার্থ
ধাতু ইত্যাদি মৌল
① কয়লা
② বেরিলিয়াম্
③ অ্যালুমিনিয়াম্
অজৈব যৌগ
জৈব যৌগ
(টলুলিন - আইসোসায়নেট্)
বড়পরিমাপের ধূলি
ছত্রাক ইত্যাদি
ধূলির আকারে
① সিমেন্ট
② চুন
③ সিলিকা
④ মাইকা
⑤ কোয়াৎজ্
⑥ অ্যাসবেসটস্
গ্যাসের আকারে
① অ্যামোনিয়া
② হ্যালোজেন গ্যাস
③ ফস্‌জেন গ্যাস
④ নাইট্রোজেন ও সালফার অক্সাইড্
⑤ টিন অক্সাইড্
⑥ লৌহ অক্সাইড্
উদ্ভিজ্জ
① তুলা
② পাট
③ শন
প্রাণীজ
(জীবানু, যথা অ্যানথ্রাক্স্)

কণাগুলির পরিমাপ সাধারণত মিশ্র আকৃতিরই হয়ে থাকে এবং শ্রমিক যখন কলকারখানা বা খনিতে কাজ করছে তখন তার পক্ষে বেশীক্ষণ শ্বাস বন্ধ করে থাকাটাও সম্ভব নয়; সুতরাং ছোট বা বড় যে পরিমাপেরই হোক না কেন ধূলিকণা যে পেশাতেই বাতাস দূষিত করে সেখানেই নিউমোকোনিওসিসের সম্ভাবনা থেকে যায়। পেশার বিচারে বিভিন্ন ক্ষতিকারক কণাকে পূর্বপৃষ্ঠার তালিকা অনুযায়ী বিন্যাস করা যেতে পারে।

আগেই বলা হয়েছে বর্তমান আইনে যাই বলুক না কেন, এক সময় ফুসফুসের যে কোন পেশাগত ব্যাধিকেই "নিউমোকোনিওসিস" বলে গণ্য করা হত। সেই হিসাবে ব্যাধিটিকে সাধারণত চারটি পর্য্যায়ে ভাগ করা যায়, যথা (১) লৌহ, টিন, বেরিয়াম এবং অ্যান্টিমনির ধূলি থেকে সাধারণ নিউমো-কোনিওসিস্ হয় —এই পর্য্যায়ে ফাইব্রোসিস না দেখা দিলেও (ক) ফুসফুসে ধূলিকণা জমে শ্বাসপ্রশ্বাসের স্বাভাবিক শারীরবৃত্ত ব্যাহত হয়, (খ) ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, অত্যধিক শ্লেষ্মা ক্ষরণ এবং শেষ পর্য্যন্ত হাঁপানী রোগ দেখা দেয়, (গ) তুলা, টল্যুলিন-ডাই-আইসোসায়ানেট (Tolulene-di-Isocyanate) ইত্যাদির ধূলি থেকে ক্লোমশাখা সরু হয়ে যায় অথবা (ঘ) বিল্লিপ্রদাহী গ্যাসের সংস্পর্শে ফুসফুসে জলজমা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিতে পারে। (২) সিলিকা, অ্যাসবেসটস্ ইত্যাদি সিলিকেট যৌগ, অথবা কয়লা, লৌহ ইত্যাদির মিশ্রধূলি থেকে ফুসফুসে ফাইব্রোসিস্ (৩) ভ্যানেডিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, বেরিলিয়াম, ক্যাড্মিয়াম ইত্যাদির ধূলি থেকে ফুসফুসের ঝিল্লি প্রদাহ এবং (৪) তুলা, পাট, শণের ধূলি বা ছত্রাক থেকে ফুসফুসে অ্যালার্জির লক্ষণ দেখা যেতে পারে। তা ছাড়া এর যে কোন একটি থেকেই ভবিষ্যতে ফুসফুসে মারাত্মক ক্রমবর্ধমান ব্যাপক ফাইব্রোসিস (প্রগ্রেসিভ মাসিভ্ ফাইব্রোসিস, P. M. F.) রিউম্যাটয়েড় (Rheumatoid) নিউমোকোনিওসিস্, এমনকি ক্যান্সার পর্য্যন্ত হতে পারে (পঞ্চম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

১৫নং তালিকা : ফুসফুসে অ্যালার্জি সৃষ্টিকারী পেশাগত ব্যাধি

রোগের নাম	ধূলির উৎস	অ্যালার্জিকারক বস্তু
ফারমারস্ লাঙ (Farmer's Lung)	ছাতা ধরা খড়	Micropolispora Faeni
ব্যাগাসোসিস্ (Bagassosis)	ছাতা ধরা আখ	Thermo-actino myces Sacchari
খাদ্যোপযোগী ব্যাঙের ছাতা নিয়ে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের ফুসফুসের ব্যাধি	পচা ব্যাঙের ছাতা	Micropolyspora Faeni
সীরান্বিত বস্তু সংক্রান্ত পেশায় ফুসফুসের ব্যাধি	ছাতা ধরা বার্লি ও সীরা	Aspargillus Clavatus
সুবেরোসিস্ (Suberosis)	ছাতা ধরা ছিপি	Penicillium Frequentans
*পক্ষিপালকের ফুসফুস	মুরগী, পায়রা ইত্যাদির বিষ্ঠা	বিষ্ঠার প্রোটিন
গুবরে পোকা লাগা গম নিয়ে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের ফুসফুসের ব্যাধি	পোকা ধরা গম বা ময়দা	Sitophilus Granari
গুঁড়া সাবান প্রস্তুত কারকের ফুসফুসের ব্যাধি		প্রোটিওলাইটিক এনজাইম।

কয়লার ধূলিজাত নিউমোকোনিওসিস্—কয়লা ওরফে "কালোমানিক (Black diamond)" বর্তমান সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য সঙ্গ। আজ থেকে প্রায় চার লক্ষ বছর আগে মানুষ আগুনের ব্যবহার শেখে এবং ধরে নেওয়া যায় প্রায় সেই সময় থেকেই তারা কয়লার সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু তখনকার দিনে আগুন তৈরী হত কাঠ কুটো জালিয়ে সুতরাং কয়লা বলতেও বোঝাত কাঠ কয়লা, পাথুরে বা খনিজ কয়লার ব্যবহার শুরু হয়েছে অনেক পরে। ৮৫২ খ্রীঃ লেখা" The Saxon Chronicle of Peterborough" তেই ইংলণ্ডে প্রথম কয়লাখনির উল্লেখ পাওয়া যায় এবং ১৫৭৮ খ্রীঃ সেখানে রাণী প্রথম

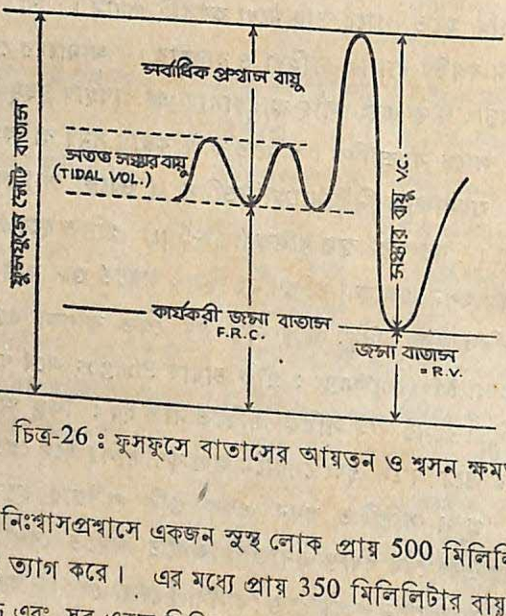
* এক সময় পাখির বিষ্ঠাকে সার (Guano) হিসাবে ব্যবহারের ফালাও ব্যবসা চালু ছিল।

এলিজাবেথের রাজত্ব কালে কাঠের আকাল দেখা দিলে খনিজ কয়লার চাহিদা বেড়ে যায়। কয়লাখনির শ্রমিকদের ফুসফুসের ব্যাধির প্রবণতার কথা প্রথম উল্লেখ করেন জন এভেলিন (১৬৬১ খ্রীঃ)। এর পর ১৯২০ সালে মিডলটন এবং র‍্যাডস্টক কয়লার গুঁড়ার সঙ্গে মেশান সিলিকার ধূলি থেকে খনি শ্রমিকদের ফুসফুসের ব্যাধি সম্বন্ধে গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেন। পরে দেখা গেল, মিশ্রিত সিলিকা ছাড়াও শুধু মাত্র কয়লার গুঁড়া থেকেও ফুসফুসের ব্যাধি হয়।

বস্তুত সিলিকা বা সিলিকেট ছাড়া আর যে সব পদার্থের ধূলিকণা থেকে ফুসফুসের ব্যাধি হতে পারে তার মধ্যে কয়লাই প্রধান। তার কারণ অবশ্য শক্তি উৎপাদনে বস্তুটির ব্যাপক চাহিদা ও ব্যবহার। আমাদের দেশেও বাষ্প শক্তি, তাপ বিদ্যুৎ শক্তি এবং লৌহ কারখানায় এর ব্যবহার বহুমুখী। ভারতে কয়লার খনিও আছে সহস্রাধিক। খনিতে কাজ করার সময় বা কলকারখানার ধোঁয়া থেকে কয়লাজাত নিউমোকোনিওসিস্ (ওরফে অ্যানথ্রাকোসিস্) হবার সম্ভাবনা। কয়লার সূক্ষ্ম ধূলিকণা (1-5 μ) শ্বসিত হয়ে ক্লোম প্রশাখা এবং ফুসফুসের শ্বসন এককে (চব্বিশ নং চিত্র) জমতে শুরু করে। ফুসফুসে সঞ্চিত কণাগুলির বেশ কিছু অংশ বড় বড় শ্বেত কণিকা জাতীয় কোষ (Phagocyte বা Macrophage ; গ্রীক ভাষায় Phagos অর্থে খাওয়া) দ্বারা ভুক্ত হয়ে লসিকা রসের সঙ্গে লসিকা গ্রন্থিতে নীত হয় ; কিছু অংশ আবার ক্লোম প্রশাখায় উঠে আসে এবং সেখানে জমা কণাগুলির সঙ্গে শ্লেষ্মার আকারে রেচিত হয়। প্লুরা সন্নিহিত শ্বসন একক গুলি পরিষ্কার হতে সব চেয়ে বেশী সময় নেয় এবং শেষ পর্যন্ত কণাগুলি জমতে জমতে বেশ কিছু একক ভর্তি হয়ে যায়, ফলে শ্বসন শারীরবৃত্তে গোলমাল দেখা দেয়। অনেকে অবশ্য একথা অস্বীকার করেন, কিন্তু শ্বসন প্রক্রিয়ার শারীরবৃত্ত পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে এজাতীয় গোলোযোগ সম্ভব।

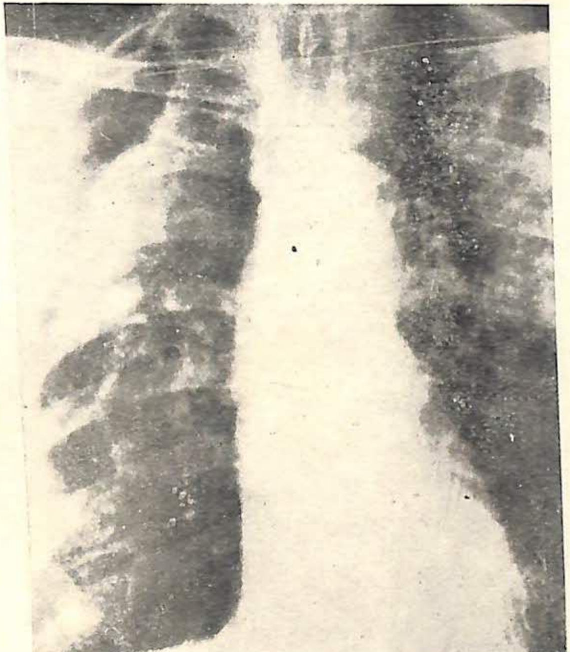
ফুসফুসের সমস্ত শ্বসন একক মিলিয়ে যতটা বাতাস ধরে (Lung Volume) তাকে মোটামুটি দু' ভাগে ভাগ করা যায় (ক) পুরো শ্বাস গ্রহণের (maximum inspiration) পর যতটা নিশ্বাস বায়ু ত্যাগ করা সম্ভব (maximum expiratory air) অর্থাৎ সঞ্চার বায়ু বা Vital Capacity এবং (খ) যে বাতাস নিশ্বাস প্রশ্বাসে কখনই অংশ গ্রহণ করে না অর্থাৎ জমা বাতাস বা

Residual Volume। বোঝাই যাচ্ছে অক্সিজেন পরিবহনে সঞ্চার বায়ুই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে; স্পাইরোমিটার যন্ত্রে এর পরিমাপ করা যায়। সঞ্চার বায়ু বলতে আবার বোঝায় যে বায়ু প্রতিটি স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসে সতত সঞ্চারমাণ (Tidal Volume) এবং যে বাতাস কেবল মাত্র প্রয়োজনে (যেমন কায়িক শ্রমের সময়) চলাচল করে। সাধারণ অবস্থায় একবার নিশ্বাসের পরও যে পরিমাণ বাতাস শ্বাসযন্ত্রে থেকে যায় সেটা জমা বাতাস (R.V) এবং আপৎকালীন নিঃশ্বাস বায়ুর সমষ্টি, এর নাম দেওয়া হয়েছে কার্য্যকরী জমা বাতাস বা Functional Residual Capacity।

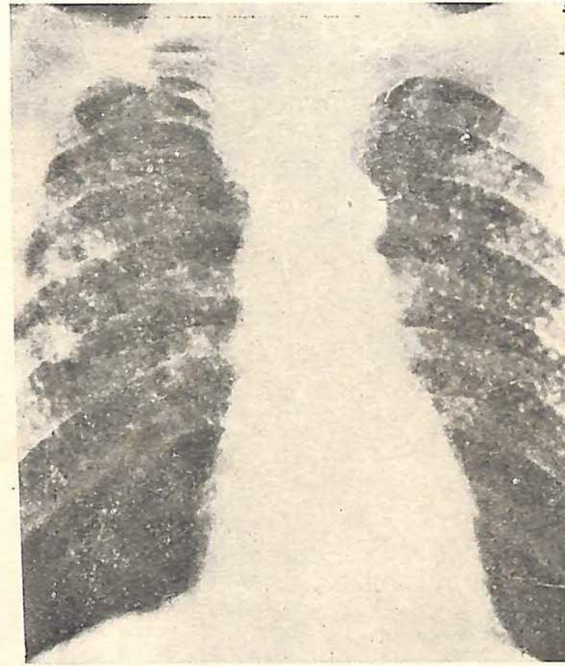


চিত্র-26 : ফুসফুসে বাতাসের আয়তন ও শ্বসন ক্ষমতা।

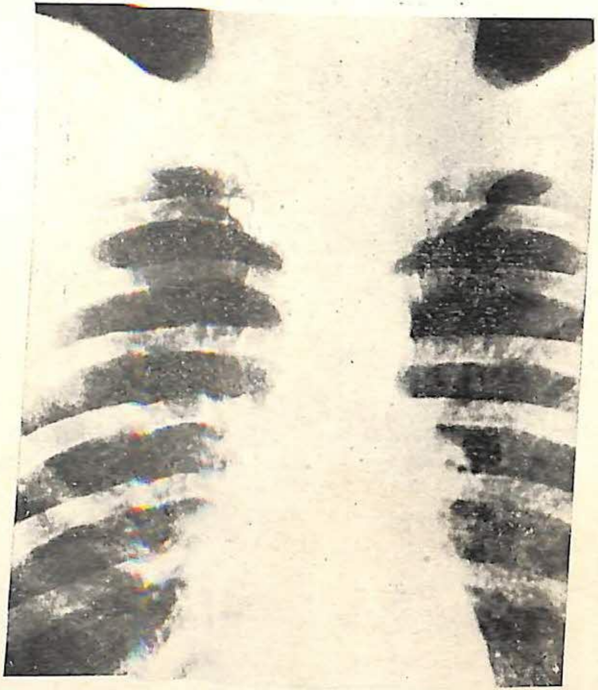
সাধারণ নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসে একজন সুস্থ লোক প্রায় 500 মিলিলিটার বাতাস গ্রহণ করে বা ত্যাগ করে। এর মধ্যে প্রায় 350 মিলিলিটার বায়ুর সঙ্গে শ্বসন এককের সম্বন্ধ এবং সব একক মিলিয়ে প্রায় 90 বর্গমিটার পরিমাণ তল থেকে প্রশ্বাস বায়ুর অক্সিজেন রক্তে প্রবেশ করে (চতুর্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। কয়লার গুঁড়া পুঞ্জীভূত হয়ে যদি বেশ কিছু বায়ুথলি (অ্যালভিওলাই) তথা শ্বসন একক বন্ধ হয়ে যায় তা হলে শ্বাসকার্য্য ব্যাহত হওয়াটাই স্বাভাবিক। অত্যধিক কয়লার কণা জমার ফলে শেষ পর্য্যন্ত আক্রান্ত ব্যক্তিরা ঝিল্লি প্রদাহ জনিত ব্রঙ্কাইটিস, কাশি এবং হাঁপানি রোগে ভুগতে শুরু করেন। ফুসফুসের একস্-রে রোগ নির্ণয়ে খুবই সাহায্য করে। কয়লার গুঁড়া জনিত সাধারণ নিউমোকোনিসস



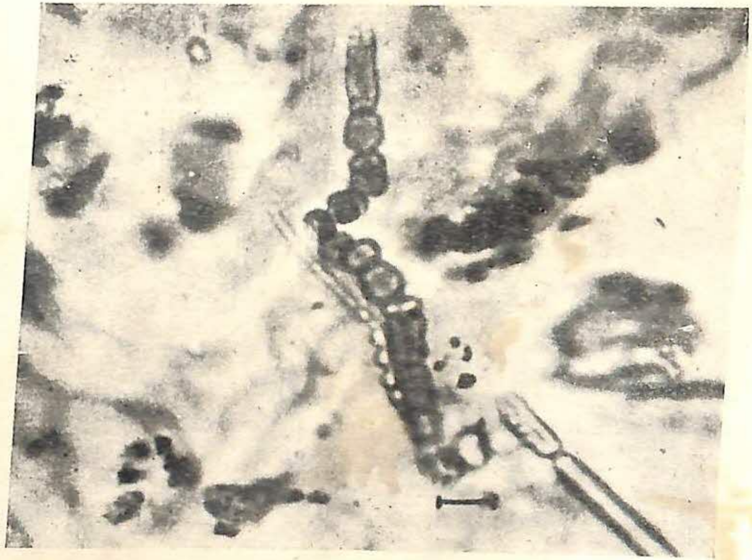
চিত্র 27 ঃ ফুসফুসে ক্রমবর্ধমান ব্যাপক ফাইব্রোসিস্।



চিত্র 28 ঃ ফুসফুসে সিলিকোসিস্ ব্যাধি



চিত্র 29 ঃ সাধারণ নিউমোকোনিওসিস ব্যাধি।



চিত্র 30 ঃ কফের সঙ্গে বেরিয়ে আসা অ্যাসবেস্‌টস্‌ কণা।

থেকে শতকরা 5-50টি ক্ষেত্রে মারাত্মক পি. এম্. এফ্ ও 2-6% রোগীর রিউমাটয়েড নিউমো-কোনিওসিস রোগ দাঁড়াতে পারে। অবশ্য আগেই বলা হয়েছে অনেকের মতে কয়লার সঙ্গে যদি শতকরা দু ভাগ সিলিকা ধূলি মেশান থাকে তবেই পি. এম. এফ্ দেখা দেয়।

সিলিকা (Silica) বা সিলিকেটের (Silicate) ধূলি লেগে ফুসফুসের ব্যাধি- ল্যাটিন ভাষায় "সিলেক্স্" অর্থে চক্মকি পাথর (flint)। মানুষ সেই পুরাতন প্রস্তর যুগ থেকেই বস্তুটির ব্যাপক ব্যবহার করে আসছে এবং এর জন্য হয়ত তারা প্রাগৈতিহাসিক যুগেও ফুসফুসের ব্যাধিতে ভুগত, আজ যাকে আমরা সিলিকোসিস বলে জানি। "Probablity suggests, therefore, that the starting point of human progress was associated with atleast one form of Silicosis—Hunter" (অতএব সম্ভাবনা এই যে অন্ততঃ এক প্রকার সিলিকোসিস সভ্যতার উন্মেষকালেও দেখা যেত—হান্টার) সিলিকা হল সিলিকন নামক মৌলটির অক্সাইড (SiO_2), এটি নিজে অথবা অন্য পদার্থের সঙ্গে সিলিকেট যৌগ যথা মাইকা, ট্যালক্ ইত্যাদি তৈরী করে এবং এগুলি ফুসফুসের ক্ষতি করে। অবশ্য এ ব্যাপারে কোয়াৎ´জের (স্ফটিক) আকারে সিলিকার কার্য্যকারিতাই সর্বাধিক। বিভিন্ন শিল্পে [যথা সোনা, তামা, টিন, গ্র্যাফাইট (কৃষ্ণসীস), কয়লা বা লোহা খনিতে, গ্রানাইট বা স্লেট পাথরের খাত্ খননে, অধিক পরিমাণ স্ফটিক সমন্বিত প্রস্তর শিল্পে, বেলে পাথর বা মৃৎশিল্পে] বস্তুটির ধূলিকণা যথেষ্ট পরিমাণ বাতাস দূষিত করে। বস্তুত নিউমোকোনিওসিস রোগের কারণ হিসাবে কয়লা না সিলিকার স্থান সর্বোপরি এ নিয়ে মতদ্বৈধ আছে। আমাদের দেশেও একদিকে যেমন কয়লা খনি প্রচুর, তেমনি অ্যাসবেসটস, মাইকা ইত্যাদি সিলিকেট ঘটিত পদার্থের খনি বা শিল্পও তো কম নয়!

সিলিকা বা সিলিকেট ঘটিত নিউমোকোনিওসিস, সংক্ষেপে সিলিকো- সিসকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায়; যথা—(১) নড্যুলার সিলিকো- সিস্ (Nodular Silicosis) যার জন্য স্ফটিক বা চকমকি পাথরের সূক্ষ্ম ধূলিকণা দায়ী। এর প্রভাবে ফুসফুসে যে ফাইব্রোসিস হয় তা ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে (২) একু্যট সিলিকোসিস (Acute Silicosis) অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের জন্য প্রচুর স্ফটিকের ধূলি শ্বসিত হয়ে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ফুসফুসের বায়ুথলি

গুলিতে ফাইব্রোসিস হয় ও লাইপো-প্রোটিন জমে এবং বছর খানেকের মধ্যেই রোগীর মৃত্যু ঘটে। (৩) মিশ্র সিলিকার ধূলি ঘটিত ফাইব্রোসিস—লৌহ অক্সাইড ইত্যাদি ধূলির সঙ্গে সিলিকার গুড়া শ্বসিত হলে আয়ু ক্ষয়ের সম্ভাবনা কমে যায় (৪) ডায়াটোমাইটের মত অনিবন্ধী (amorphus) সিলিকার গুঁড়া ঘটিত ফাইব্রোসিসও বহু দিন ধরে ধীরে ধীরে ফুসফুসের ক্ষতি করে।

কয়লার ক্ষেত্রেও যেমন, সিলিকার ক্ষেত্রেও তেমনি শ্বসন এককে অনুপ্রবিষ্ট কণাগুলিকে ফ্যাগোসাইটরা খেয়ে ফেলে, কিন্তু সিলিকার বিষে ফ্যাগোসাইটরা মরে যায় এবং এই মৃত ফ্যাগোসাইটরা আবার অন্য ফ্যাগোসাইট দ্বারা ভুক্ত হলে দ্বিতীয় দলও মৃত্যু বরণ করে। এই ভাবে ফুসফুস মৃত ফ্যাগোসাইটের কবরখানায় পরিণত হয়। এই সব মৃতদেহ থেকে যে অপদ্রব্য নির্গত হয় তারাই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ফুসফুসে ফাইব্রোসিস সৃষ্টি করে। অনেকে আবার এও বলেন যে সিলিকার ধূলি শরীরে যে অ্যান্টিজেন—অ্যান্টিবডি বিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তার থেকে কেবল ফাইব্রোসিস বা নড্যুল (nodule) নয়, এই নড্যুল থেকে ভবিষ্যতে ক্যান্সার পর্য্যন্ত হতে পারে।

দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় বা কলে কারখানায় আমরা যত রকম সিলিকেট দ্রব্য ব্যবহার করি তাদের প্রধাণত দু ভাগে ভাগ করা যায়, (ক) আঁশের মত—যথা অ্যাসবেসটস্, ট্যালক্, সেরিসাইট (Sericite), সিলিম্যানাইট (Sillimanite) বা গ্লাস উল, ওরফে ফাইবার গ্লাস এবং (খ) গুড়া—যথা মাইকা, কেওলিন ইত্যাদি। ইলেকট্রিক মিস্ত্রীদের ব্যবহৃত ডেটোফিকস বা ছাউনির জন্য অ্যাসবেসটস্ শিটের দৌলতে অ্যাসবেসটস বস্তুটির সঙ্গে আমরা সবাই অল্পবিস্তর পরিচিত এবং এটি যে বিদ্যুৎ ও তাপ কুপরিবাহী বা এসিডে ক্ষয় না তাও অনেকে জানেন। প্রধানত আঁশযুক্ত বলে বস্তুটি বহু ভাবে বহু কাজে ব্যবহৃত হয় এবং দু'হাজার বছর ধরে হয়ে আসছে। শার্লেমন রাজার নাকি অ্যাসবেসটসের তৈরী একটি টেবিলক্লথ ছিল যেটিকে অগ্নিদগ্ধ করে পরিষ্কার করা হত। ১৮৯০ সাল থেকে এটি বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে।

অ্যাসবেসটসের আঁশ থেকে ফুসফুসের ব্যাধি প্রথম লক্ষ্য করা হয় ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর কুক্ ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে রোগটির বিশদ বর্ণনা দেন। সিলিকার মত এই সিলিকেটও ফুসফুসে ফাইব্রোসিস তৈরী করে কিন্তু এটি সিলিকার মত

সরাসরি ফ্যাগোসাইটের ওপর বিষক্রিয়া না ক'রে আঁশের খোঁচায় কোষ আচ্ছাদনের ভেদ্যতা (membrane permeability) বাড়িয়ে ফ্যাগোসাইটের মৃত্যু ঘটায়।

অ্যাসবেসটসের প্রভাবে ফুসফুসের ক্যান্সারের কথা প্রথম উল্লেখ করেন লিনচ্ ও স্মিথ (১৯৩৫ খ্রীঃ)। পার্কস প্রমুখেরা মনে করেন আগে ফাইব্রোসিস না হলে অ্যাসবেসটসের দরুণ ফুসফুসের ক্যান্সার হয় না এবং ধূমপান ক্যান্সারের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। ক্যান্সার তৈরীর ব্যাপারে ক্রাইসোলাইট (Chrysolite) জাতীয় অ্যাসবেসটসই সবচেয়ে ক্ষতিকারক। ফুসফুস ছাড়াও ফুসফুসের আচ্ছাদনে (Pleura) অ্যাসবেসটসের প্রভাবে মেসোথিলিওমা জাতীয় ক্যান্সার হয়। অপর দলের মত হ'ল অ্যাসবেসটস ফুসফুসে যে দানা তৈরী করে (Asbestos bodies) তার থেকেই কালক্রমে ক্যান্সার হয়। অ্যাসবেসটোসিস রোগক্রান্তের শ্লেষার সঙ্গে আঁশ বেরতে পারে এবং অনুবীক্ষণে পরীক্ষা করলে তাদের পরিষ্কার দেখা যায়। এ সব ছাড়াও অ্যাবেসটসের প্রভাবে প্লুরার ওপর মড়মড়ি (Plaques) জমতে পারে। **I. T. R. C.** র গবেষণায় প্রকাশ পেয়েছে, যে সব শ্রমিকের রক্তের গ্রুপ A ও B তাঁরা অ্যাসবেসটোসিস (Asbestosis) রোগে বড় একটা আক্রান্ত হন না।

আঁশ বিযুক্ত গুঁড়া সিলিকেটের মধ্যে মাইকা অর্থাৎ জটিল অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেটের ব্যবহার বহুমুখী। সারা পৃথিবীর শতকরা 70 ভাগ মাইকার চাহিদা মেটায় ভারত। মাইকা বা অভ্রের সুবিধা হল এর পাত (shee:) গুলিকে যথেচ্ছ ভাবে রোল করা যায় আবার স্থিতিস্থাপকতার জন্য ছেড়ে দিলে পূর্বের আকার ফিরে পায়। পদার্থটি অগ্নিনিরোধক ও স্বচ্ছ, সুতরাং এটি কাচের পরিবর্তে আলোর চিমনি, ফারনেসের জানলা ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হয়। মাইকাজাত ফুসফুসের ব্যাধিকে মাইকাটোসিস্ নাম দেওয়া হয়েছে।

সোডিয়াম অথবা পটাশিয়াম ঘটিত অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট বিযোজিত হয়ে আর এক রকম আঁশবিহীন গুঁড়া তৈরী হয় যার নাম কেওলিন বা চীনামাটি।.বস্তুটি প্রথম আবিষ্কৃত হয় চীনে এবং এটি চৈনিক কাউ-লিং কথার অপভ্রংশ। কাগজ তৈরীতে, বাসন পত্র তৈরী করতে, চিকিৎসার কাজে

বস্তুটি ব্যবহৃত হয়। এর প্রভাবে অবশ্য কর্মীদের বিশেষ কোন শারীরিক ক্ষতি হয় না।

(খ) ফুসফুসে পেশাগত অ্যালার্জি

আজকাল চিকিৎসকরা ফুসফুসের পেশাগত অ্যালার্জিজনিত রোগগুলিকে নিউমোকোনিওসিস পর্য্যায়ে গণ্য করতে নারাজ, যেমন তুলাঘটিত অ্যালার্জিকে নিউমোকোনিওসিস সংজ্ঞা থেকে সরাসরি বাদ দেওয়া হয়েছে। ১৫নং তালিকায় উল্লিখিত ব্যাধিগুলি মোটামুটি জৈব পদার্থঘটিত এবং যেহেতু ভারত কৃষিপ্রধান দেশ তাই অন্তত আমাদের দেশে এদের নিউমোকোনিওসিস সংক্রান্ত আইনের আওতায় আনা যুক্তিযুক্ত হবে বলে আমি মনে করি। যাই হোক অজৈব পদার্থ থেকেও ফুসফুসে অ্যালার্জি হতে পারে। এই পর্য্যায়ের ব্যাধিগুলিকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) পেশাগত হাঁপানি—ক্লোম শাখা প্রশাখার সাময়িক সঙ্কুচনে যে শ্বাস কষ্ট দেখা দেয় তার চেয়ে কষ্টকর ব্যাধি আর আছে কিনা সন্দেহ ; অথচ এ রোগে মৃত্যুর সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। ১৯৭৪ সালে পার্ক্‌স্ পেশাগত কারণে ক্লোম শাখা প্রশাখাগুলির স্নায়ুকাতরতার সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন। তাঁর প্রথম উদাহরণ, ময়দায় যে ছোট ছোট পোকা (weevil) হয় বা গমের দানা থেকে অ্যালার্জি ও হাঁপানি। তারপর যে সব শ্রমিক পলিইউরিথেন বা ফোম প্লাস্টিক তৈরী করেন তাঁদের হাঁপানি হতে পারে টলুলিন ডাই আইসোসায়ানেট (TDI) বা ডাইফেনিল মিথেন ডাই আইসোসায়ানেট (M.D.I)-এর সংস্পর্শে। শিল্পে এই আইসোসায়ানেট বস্তুটির সর্বোচ্চ নিরাপদ সীমা ধার্য্য করা হয়েছে 0.02 পি. পি. এম। এছাড়াও পার্ক্‌স্ পেশাগত হাঁপানির আর যে যে কারণ উল্লেখ করেছেন সেগুলি হল—(১) জৈব ধোলাই পাউডারে (Biological washing powder) ব্যাসিলাস সাবটিলিস জাত যে প্রোটিন বিযোজক (proteolytic enzyme) এনজাইম পাওয়া যায়, (২) অ্যাকেসিয়া (acacia) বা লাল সীডার কাঠের গুঁড়া, (৩) ক্লোরো প্ল্যাটিনেট জাতীয় প্ল্যাটিনাম ধাতুর জটিল যৌগ (৪) শিপ্ ডিপে (ভেড়াদের অ্যানথ্রাকস মুক্ত করতে রাসায়নিক যুক্ত যে তরল পদার্থ ব্যবহার করা হত

তাকে শিপ্‌-ডিপ্‌ বলে) ব্যবহৃত পাইপেরাজিন এবং (৫) অ্যালুমিনিয়াম ঝালাই করলে যে গলিত পদার্থ নির্গত হয় তার থেকে নির্গত অ্যামোনিয়া গ্যাস।

(খ) বহিরাগত অ্যালার্জির নিমিত্তে অ্যালভিওলাইটিস (External allergic alveolitis)—আমাদের দেশে অবশ্য জল হাওয়ার জন্য খড়ে বড় একটা ছাতা ধরে না, সুতরাং "ফারমারস লাঙ" ব্যাধিও এখানে দেখা যায় না ; কিন্তু বিলেতে ব্যাধিটি প্রায়ই দেখা যায়। তবে উত্তর ও মধ্য প্রদেশে আখের ক্ষেতের কর্মীদের মধ্যে ব্যাগাসোসিস রোগাক্রান্তের সংখ্যা খুব কম নয়। ১৯৭৭ সালে ফ্রেণ্ড প্রমুখ গবেষকরা এক কৌতূহলোদ্দীপক পেশাগত ফুসফুসের অ্যালার্জি লক্ষ্য করেছিলেন। এক কারখানায় শ্রমিকরা ভ্যাকুয়াম পাম্প ও এয়ার কমপ্রেসার নিয়ে কাজ করার সময় যন্ত্রগুলির মধ্যে প্রবহমান জল জীবাণুর দ্বারা দূষিত হয়ে তাদের ফুসফুসের ব্যাধি হত এবং মজায় কথা, দম বন্ধ হয়ে আসা, কাঁপুনি, কাশি ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিত সপ্তাহে একদিন—সোমবার। ঠিক সোমবারই যে কোন উপসর্গগুলি দেখা দিত সে কারণ অবশ্য জানা যায় নি।

(গ) বিভিন্ন ধুলিকণা থেকে যে অ্যালার্জির ফলে শ্বাসকষ্ট হতে পারে সে অভিজ্ঞতা কেবল পেশাবিশেষে নিযুক্ত ব্যক্তির নয়. সাধারণ লোকেরও আছে।

(ঘ) তুলা, পাট, শণ ইত্যাদির সংস্পর্শে শ্রমিকদের ফুসফুসে যে অ্যালার্জি হয় (বাইসিনোসিস) তার সঠিক কারণ এখনও খুঁজে বার করা সম্ভব হয় নি। তবে মোটামুটি এরা হাঁপানি সৃষ্টি করে এবং শুরুতে সপ্তাহের প্রথম দিকেই দু একদিন এটি থাকে বলে অনেকে এর নাম দিয়েছেন "Monday tightness"। পরে অবশ্য ব্যাধিটি ক্রনিক হয়ে দাঁড়ায়।

অনায়াসসাধ্য পেশার কুফল

পেশাগত ব্যাধির বিচারে আনবিক দানবের (!) চেয়েও মানুষের বড় ক্ষতি করেছে আধুনিক যন্ত্র যুগ। বিবর্তনের ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যাবে বর্তমান মানুষের বৈশিষ্ট তার চেহারায় নয়, শরীর তার মোটামুটি নিয়ানডারথাল বা ক্রোম্যাগনন্ পূর্বসূরীদেরই মত, প্রকৃতিতে তো বটেই এমনকি আজও শিকার পেশার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করারই উপযোগী তার শারীরবৃত্ত। কিন্তু সভ্যতার প্রভাবে আজ বেশীর ভাগ মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী প্রাগৈতিহাসিক মানুষের চেয়ে ভিন্ন হয়ে পড়েছে, তাদের তুলনায় হোমোসেপিয়ন্সদের বেশীর ভাগ পেশাই অনায়াসসাধ্য। যে হৃদরোগকে আজ মনুষ্য প্রজাতির "Greatest Killer" বলা হয় অথবা যে ডায়াবিটিস্ (বহুমূত্র বা মধুমেহ রোগ) হাইপারটেনশন (উচ্চ রক্ত চাপ), অসটিও আরথ্রাইটিস (বাত ব্যাধি), পেপটিক আলসার (পাকস্থলী ও ডিওডেনামে ক্ষত) আজ প্রায় ঘরে ঘরে, পৃথিবীর চিকিৎসক সমাজ একমত যে তাদের জন্য দায়ী মানুষের সুসভ্য জীবন যাত্রা ও সিডানটারি অকুপেশন।

ডায়াবিটিস, রক্তচাপ ও হৃদরোগ—কায়িক শ্রমের সঙ্গে এই সব রোগগুলির সম্বন্ধ জানতে হলে সর্বাগ্রে প্রাণীদের শারীরবৃত্ত সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। প্রখ্যাত শারীরবিদ ক্লড বার্নার্ড বলেছিলেন প্রত্যেক উচ্চশ্রেণীর প্রাণী শরীরের অন্তঃপরিবেশ (milieu interior) বহিঃপরিবেশের সঙ্গে একটা সুসমঞ্জস্য স্থিতাবস্থা (Homeostasis) রক্ষা করে চলে। মানসিক, শারীরিক বা পারিপার্শিক কোন কারণে যদি এই স্থিতাবস্থা বিঘ্নিত হয়, শারীরবৃত্তের প্রভাবে সেই স্থিতাবস্থা সঙ্গে সঙ্গে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করে এবং নিরোগ শরীরে তা সম্ভবও হয়। এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে কুকুর বিড়াল ইত্যাদি প্রাণী নিয়ে পরীক্ষা করে আর এক শারীরবিদ ওয়ালটার ক্যানন দেখিয়েছেন যে পূর্বাবস্থা পুনঃস্থাপনে মুখ্যভূমিকা গ্রহণ করে প্রাণীদেহের সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র, দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রত্যক্ষভাবে এড্রিনালিন হর্মোনের মাধ্যমে এবং পরোক্ষভাবে সুপ্রারিনাল্ (Suprarenal) অন্তক্ষরি গ্রন্থিকে অতিরিক্ত

এড্রিনালিন তৈরী করতে উত্তেজিত করে। এই এড্রিনালিন জাতীয় ক্যাটাকোলামাইন (Catacholamine)-গুলিই আপৎ অবস্থা মোকাবিলার প্রধান এবং তাৎক্ষণিক হাতিয়ার। একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাক।

১৬নং তালিকা : শরীরের বিভিন্ন যন্ত্রের ওপর সিমপ্যাথেটিক, প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রের প্রভাব

	সিমপ্যাথেটিক	প্যারাসিমপ্যাথেটিক
হৃৎপিণ্ড	হৃৎপিণ্ড ও নাড়ীর বেগ বৃদ্ধি পায়। হৃৎপিণ্ডের পেশী জোরে জোরে সঙ্কুচিত হয়। ফলে অনেক সময় বুক ঢিপ ঢিপ করে। রক্ত চাপ বৃদ্ধি পায়। করোনারী ধমনীগুলি প্রসারিত হয়ে হৃৎপিণ্ডের পেশীতে রক্ত সঞ্চালন বেড়ে যায়।	নাড়ীর বেগ কমে যায়, পেশীর সঙ্কোচন ক্ষমতা কমে যায়। রক্ত চাপ নিম্নাভিমুখী হয়। করোনারী ধমনীগুলিতে রক্ত চলাচল কমে যায়।
শ্বাসপ্রশ্বাস	দ্রুত ও গভীর হয়।	শ্বাসপ্রশ্বাস ধীরে বইতে থাকে।
মস্তিষ্ক	মস্তিষ্কের ধমনীগুলির ওপর সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুর বিশেষ প্রত্যক্ষ প্রভাব না থাকলেও রক্ত চাপ বৃদ্ধির ফলে মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধি পায়।	মস্তিষ্কের রক্ত চলাচল কমে যায়। ফলে অনেক সময় জ্ঞান হারাতে হয়।
চোখ	চোখের মণি বড় হয়ে যায় এবং সাধারণভাবে চোখ বিস্ফারিত হয়।	চোখের মণি ছোটহয়েযায়।
লালাগ্রন্থি	লালাগ্রন্থির ক্ষরণ কমে যায়, মুখ শুকিয়ে ওঠে।	মুখে প্রচুর লালা নির্গত হতে আরম্ভ করে।

	সিমপ্যাথেটিক	প্যারাসিমপ্যাথেটিক
পাকস্থলী ও অন্ত্র	পেশী এলিয়ে পড়ে, খাদ্য চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। মেসেনট্রির ধমনীগুলি সঙ্কুচিত হয়ে অন্ত্র রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়।	পাকস্থলী ও অন্ত্রে দ্রুত খাদ্য চলাচল করতে থাকে।
চর্ম	অনুধমনী সঙ্কুচিত হয়ে চর্মের রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে চর্ম ফ্যাকাসে বর্ণ ধারণ করে। হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।	রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে চর্ম রক্তবর্ণ ধারণ করে।
	সিমপ্যাথেটিক স্নায়ু উত্তেজিত হলে স্বেদগ্রন্থি থেকে ঘর্ম নিঃসরণ হয় তবে এড্রিনালিন হর্মোনের প্রভাবে ঘর্ম নিঃসরণ কমে যায়। লোম খাড়া হয়ে ওঠে।	ঘামে হাত পা, শরীর ভিজে ওঠে।
মাংসপেশী	মাংস পেশীতে রক্ত চলাচল কমে যায়।	পেশীর রক্ত সঞ্চালন বেড়ে যায়।
মলদ্বার ও মূত্রাশয়	মলমূত্র স্তম্ভিত হয়ে পড়ে।	ঘন ঘন মলমূত্র ত্যাগের ইচ্ছা জাগে।

(বিঃ দ্রঃ—সাধারণত বিভিন্ন মানসিক উত্তেজনায় আমাদেয় শারীরিক প্রতিক্রিয়া ভিন্ন। ওপরের তালিকায় সিমপ্যাথেটিক ও প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রের যে সকল কার্যাবলী উল্লেখ করা হল, হয়তো দেখা যাবে বিশেষ উত্তেজনায় এ দুটির মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে।)

কোন প্রাণী আক্রান্ত হলে ভয়ে বা প্রতিআক্রমণের স্পৃহায় অথবা শিকারী প্রাণীরা শিকারের সন্ধান পেলে তাদের যে মানসিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় তার ফলে গুরুমস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসের অনুপ্রেরণায় সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র উত্তেজিত হয়ে পড়ে যার জন্য রক্তে এড্রিনালিনের পরিমান বেড়ে গিয়ে

শরীরের বিভিন্ন যন্ত্রে তার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। যকৃৎ ও পেশীর ভাণ্ডার থেকে গ্লাইকোজেন ভেঙে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং দেখা যায় সেখানে স্নেহজাতীয় কোলেসটেরলের পরিমাণও বেড়ে গেছে। তা ছাড়া এড্রিনালিন রক্ত চাপ বৃদ্ধি করে বিভিন্ন কলাতে এ দুটি দাহ্য পদার্থ পৌঁছে দিতে সাহায্য করে। (শারীরবৃত্তে একটা প্রবাদ আছে "Fat burns in the flame of Carbohydrate", বাঙলা করলে যার মানে দাঁড়ায় শর্করার অগ্নিতে ঘৃতাহুতি)। আপৎ অবস্থা মোকাবিলা করতে যে বর্ধিত শক্তির প্রয়োজন সেটি সরবরাহ করতেই এই ব্যাপক প্রস্তুতি। পশুরা সহজাত প্রবৃত্তির দাস বলে তাৎক্ষণিক কর্মের দ্বারা মানসিক উত্তেজনায় সাড়া দেয়, ফলে তাদের রক্তে এই বর্ধিত পরিমান গ্লুকোজ ও কোলেসটেরল দগ্ধ হয়ে যাবার সুযোগ পায় এবং স্নায়ুচাপ কেটে গেলে প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ু তন্ত্রের প্রভাবে রক্ত চাপ ও নাড়ীর বেগ হ্রাস পায়, স্থিতাবস্থা ফিরে আসে।

আমরা বিংশ শতাব্দীর সভ্য মানুষ, সুতরাং খাদ্য সংগ্রহের জন্য আমাদের নিয়ানডারথাল বা ক্রোম্যাগনন পূর্বপুরুষের মত শিকার পেশার প্রয়োজন নেই। তবু অন্ন সংস্থান করতে গেলে একটা না একটা জীবিকা থাকা চাই এবং ঠিক শিকার পেশার মত না হলেও প্রত্যেক বৃত্তিতেই কিছু না কিছু মানসিক উত্তেজনা আছেই (একাদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তা ছাড়াও আজকের যুগে জীবন যাত্রা এত জটিল হয়ে পড়েছে যে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত আমরা দৈনন্দিন নানা স্নায়ুচাপে ভুগি। যেহেতু আমাদের শারীরবৃত্তটা আগের মতই থেকে গেছে, আদিম মানুষের মতই আমাদের রক্তেও এই সব আপৎ অবস্থায় গ্লকোজ ও কোলেসটেরলের পরিমাণ বেড়ে যায়, অথচ আমাদের পেশা তুলনামূলক ভাবে সিডানটারি অর্থাৎ অনায়াসসাধ্য এবং আমরা তাৎক্ষণিক ক্রিয়ার দ্বারা মানসিক উত্তেজনায় সাড়া দিই না। সুতরাং আমাদের শরীর ও সংস্কৃতির অসঙ্গতির ফল দাঁড়াল এই যে আপৎ অবস্থা মোকাবিলার জন্য সৃষ্ট দাহ্য পদার্থগুলি দগ্ধ হবার সুযোগ পেল না। প্রথম প্রথম অবশ্য অগ্ন্যাশয়ের β কোষ নিসৃত ইনসুলিন হর্মোনের প্রভাবে রক্তে এই সব পদার্থগুলির পরিমাণ কমে স্থিতাবস্থা ফিরে আসবে, কিন্তু ক্রমাগত বাড়তি কাজ করতে করতে বা অন্য কারণে উক্ত যন্ত্রাদি ক্লান্ত হয়ে পড়লে বয়সকালে ডায়াবিটিস (বহুমূত্র, মধুমেহ) রোগ দেখা দিতে

পারে এবং ধমনী বা অন্তধমনীগুলিতে কোলেসটেরল জমে রক্ত চাপ বৃদ্ধি, হৃদরোগ বা সন্ন্যাস রোগ দেখা দিতে পারে। বুঝতে অসুবিধা নেই, এই সব পরোক্ষ পেশাগত ব্যাধি প্রতিরোধকল্পে ডাক্তারেরা কেন সিডানটারি পেশার লোকেদের ব্যায়ামের মাধ্যমে দৈনিক কিছু পেশী সঞ্চালনের উপদেশ দেন। লক্ষনীয়, সমাজে যাঁরা যত বেশী প্রতিষ্ঠিত, তাঁরা খাদ্যে শর্করা (গ্লুকোজ) বা কোলেসটেরল (ডিম, মাখন ইত্যাদির মাধ্যমে) গ্রহণ করেন বেশী, অথচ তাঁদের পেশাতে শরীর সঞ্চালনের প্রয়োজন তত কম; সুতরাং সমাজের তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর মধ্যেই এই সব রোগের প্রাদুর্ভাব সর্বাধিক।

পেপটিক আলসার—বেলি ও লাভের লেখা শল্য চিকিৎসার গীতায় (!) বলা হয়েছে "Stress and anxiety are undoubtedly leading causes of duodenal ulcer."* (মানসিক চাপ ও উদ্বেগ নিঃসন্দেহে ডিওডেনামে ক্ষতের মুখ্য কারণ)। প্রসঙ্গত, পাকস্থলী ও ডিওডেনামের ঝিল্লিতে এসিড পেপসিন পরিপাক সংক্রান্ত ক্ষতকে পেপটিক আলসার বলে এবং আমাদের দেশে ডিওডেনাল আলসারের অনুপাতই সর্বাধিক। বস্তুত এ জাতীয় ক্ষতকে সভ্যতারই অবদান বলা চলে। শুধু তাই নয়, পেশার সঙ্গেও এর গভীর সম্বন্ধ আছে। ওই বেলি ও লাভের উদ্ধৃতিতেই "Occupation has some bearing on this codition (peptic ulcer), thus significantly high incidences are found amongst doctors, foremen and executives..."।* শুধু মানসিক চাপের জন্য নয়, যে সব পেশায় শ্রমিকরা শরীরের অযত্ন করতে বাধ্য হন (যেমন ডাক্তার, বাস ড্রাইভার, মোটর গাড়ীর মিস্ত্রী ইত্যাদি), যাঁদের খাওয়া দাওয়ার মান ও সময়ের কোনই স্থিরতা নেই (যেমন ডাক্তারের ক্ষেত্রে "Seeing patients between meals and telephone calls" অথবা মোটরগাড়ীর মিস্ত্রীদের বদভ্যাস বহুক্ষণ খালিপেটে ঘন ঘন চা ও সিগারেট খাওয়া) তাঁদের মধ্যেই রোগটির প্রাদুর্ভাব বেশী। মানসিক চাপ ও শরীরের অযত্নের সঙ্গে ব্যাধিটির সম্বন্ধ খুঁজতে গেলে এসিড পেপসিন পরিপাকের শারীরবৃত্ত সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা দরকার।

---

* [নিঃসন্দেহে এই ব্যাধির (পেপটিক আলসার) সঙ্গে পেশার সম্বন্ধ আছে, তাই ডাক্তার, ফোরম্যান, নির্বাহীদের মধ্যে এই ব্যাধির সংখ্যা নজরে পড়ার মত বেশী]।

আয়ুর্বেদে পেপটিক আলসারের ব্যথাকে যথার্থই অম্লশূল বলা হয়, কারণ অন্তত ডিওডেনাল আলসারের ক্ষেত্রে প্রমাণ পাওয়া গেছে পাকস্থলীর ঝিল্লি থেকে অতিরিক্ত হাইড্রোক্লোরিক এসিড (অম্ল) ক্ষরণই এর জন্য দায়ী। শারীরবিদ্‌রা বলেন মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালেমাস ও ভেগাস নামক প্যারাসিম-প্যাথেটিক স্নায়ুর মাধ্যমে গুরু মস্তিষ্ক পাকস্থলীর এসিড ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। তা ছাড়াও সুস্থ শরীরে ইনসুলিন প্রয়োগ করে দেখা গেছে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমে গেলেও পাকস্থলীর এসিড ক্ষরণ বেড়ে যায়। সুতরাং মানসিক চাপে বা বহুক্ষণ উপবাসে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে কম হতে হতে যে এক সময় পেপটিক আলসার দেখা দেবে এতে আর আশ্চর্য্য কী? ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রখ্যাত শারীরবিদ্ হানস সাইলি "Stress Syndrome" বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, কোন উচ্চশ্রেণী প্রাণীর বহিঃ পরিবেশ যদি হঠাৎ পরিবর্তিত হয় তবে তৎক্ষণাৎ শরীরে "বিপদ সঙ্কেত প্রতিক্রিয়া বা "alarm reaction" দেখা দেয়। এই অবস্থায় এড্রিনাল কর্টেক্সের গ্লূকোকর্টিকয়েড (Glucocorticoid) সমেত সমস্ত ক্ষরণ সাময়িক ভাবে স্তব্ধ হয়ে যায়। ফলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং ভেগাস উত্তেজিত হয়, যা আবার পেপটিক আলসার তৈরীতে সাহায্য করে। সুসভ্য মানুষ যদিও প্রতিনিয়ত স্নায়ুচাপ জনিত বিপদ সঙ্কেত অনুভব করছে, প্রকৃতিদেবী কিন্তু বার বার চেষ্টা করে যাচ্ছেন স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে আনতে; কী করে তাই বলি। প্রথমত রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ হ্রাস পেলে অগ্ন্যাশয়ের α কোষ থেকে গ্লূকাগন নামে হর্মোন নিসৃত হয়ে রক্তে গ্লুকোজের স্থিতাবস্থা ফিরে আসে এবং দ্বিতীয়ত বিপদ সংকেত প্রতিক্রিয়া শেষ হয়ে গেলে এড্রিনাল করটেক্সে উদ্দীপনার পর্য্যায় বা "Stage of Stimulation" দেখা যায়, যার ফলে গ্লুকোকর্টিকয়েড নিসৃত হয়ে গ্লাইকোজেন ভাণ্ডার থেকে এবং প্রোটিনের মত অশর্করা পদার্থ থেকে গ্লুকোজ উৎপন্ন হতে শুরু করে। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে প্রকৃতি দেবী কোন কিছুরই আধিক্য পছন্দ করেন না, তাই মানসিক চাপ যদি বহু সময় বিদ্যমান থাকে তখন (ক) এড্রিনাল করটেক্সের পরিশ্রান্ত পর্য্যায় বা "Stage of Exhaustion" দেখা যায় এবং রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ এক্ষেত্রে কমে গিয়ে আর বাড়ে না (খ) তখন গ্লূকাগনজনিত হাইপার গ্লাইসিমিয়াও অগ্ন্যাশয়ের β কোষগুলিকে সাধ্যাতীত পরিশ্রম করিয়ে ইনসুলিন ক্ষরণ করতে বাধ্য করে

(শেষ পর্যন্ত এগুলিও অবসন্ন হয়ে পড়ে এ কথা আগেই বলা হয়েছে)। ফলে ডিওডেনাল আলসার ও অম্লশূল দেখা দেয়।

বাত ব্যাধি—প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বলেন প্রাণী বিবর্তনের ইতিহাসে সোজা হয়ে দাঁড়াবার ফলে বাঁচার লড়াইয়ে মানুষের অনেক সুবিধা হয়েছিল। তবে সুবিধার সঙ্গে একটি অসুবিধাও মানুষ ভোগ করে আসছে; দাঁড়াবার ফলে তার মেরুদণ্ডটি অন্যান্য প্রাণীর মেরুদণ্ডের চেয়ে সর্বাংশে দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাই প্রাণী জগতে একমাত্র মানুষই কোমর ও গলদেশে বাতের মত যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধিতে কষ্ট পায়।

কোমরে বাত ও তজ্জনিত কোমরে ব্যথা আজকাল ঘরে ঘরেই দেখা যায় এবং প্রৌঢ় ও বৃদ্ধরাই এই রোগে আক্রান্ত হন বেশী। রোগটির বহু কারণ আছে। বস্তুত সাধারণ কোষ্ঠ কাঠিন্য থেকে শুরু করে কশেরুকার জটিল টিউমার পর্যন্ত কোমরে ব্যথার এত কারণ আছে যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পক্ষেও সব মনে রাখা সম্ভব হয় না। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় এটি বাতের ব্যথা, ইংরাজিতে যাকে বলা হয় অসটিও আরথ্রাইটিস অফ স্পাইন (Osteo arthritis of spine) বা স্পন্ডিলাইটিস (Spondylitis)। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বলা হয় শরীর বায়ু কুপিত হলে বাত দেখা দেয় কিন্তু পাশ্চাত্য মতে দেহের সন্ধিগুলির ওপর প্রতিনিয়ত যে পেষণ বা stress and strain চলছে তার ফলে এগুলিতে যে অবক্ষয় ঘটে তার থেকেই বাতের উৎপত্তি। মেরুদণ্ডের কশেরুকার সন্ধিগুলিও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়, বরঞ্চ সোজা হয়ে দাঁড়াবার ফলে মানুষের গ্রীবা ও কটিদেশের মেরুদণ্ডের ওপর পেষণ সর্বাধিক। তাই এই দু'জায়গায় বাতের প্রকোপ বেশী।

কশেরুকার ওপর চাপ ও পেষণ (stress ও strain) সভ্য মানুষের ক্ষেত্রে আরও বেশী কারণ তাদের বসা বা চলার ভঙ্গিমা। প্রকারান্তরে বলা যায় মানুষের আবাল্য চেয়ার টেবিলের অভ্যাসটি মারাত্মক। বাল্যকালে পড়া-শোনা করার সময় থেকে কোমর ও পিঠ ধনুকের মত বেঁকিয়ে বসার বদভ্যাসের সূত্রপাত, তার পর আসে কর্মজীবন এবং সে ক্ষেত্রেও বেশীর ভাগ মানুষের দশটা থেকে পাঁচটা ঘাড় গুঁজে ডেস্ক ওয়ার্ক করতে হয়। তার পর দিনের বাকি সময়ে কায়িক শ্রমের আর কোন প্রয়োজন অথবা সম্ভাবনা থাকে না। ফলে

শরীরের মাংস পেশীগুলি, বিশেষ করে মেরুদণ্ড প্রসারণকারী (Erector spince) পেশী দুর্বল হয়ে পড়ে। দেখা গেছে আমরা যখন সামনে ঝুঁকে মাটি থেকে কোন জিনিস তোলবার চেষ্টা করি তখন প্রথম শ্রেণীর লিভার ক্রিয়ায় মেরুদণ্ড এবং ত্রিকাস্থির সন্ধিস্থলে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়। ফলে এই স্থানের কশেরুকাদ্বয়ের মধ্যবর্তী ডিস্ক (Disc of Fibrocartilege) ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা প্রচুর। বস্তুত যে সব কায়িক শ্রমিকদের প্রায়ই ভারি ভারি ওজন তুলতে হয় তাদের হঠাৎ কোমরের এই জায়গায় ডিসক্ থেঁতলে বা prolopse করে অসহ্য যন্ত্রণা হতে পারে। কিন্তু সুস্থ সবল শরীরে সাধারণতঃ পৃষ্ঠদেশ সম্প্রসারণকারী পেশী (এবং তার সঙ্গে পেটের ও বুকের পেশী) টানার (Guy Ropes) কাজ করে মেরুদণ্ডকে এই প্রচণ্ড চাপ থেকে রক্ষা করে। স্বতই এগুলি দুর্বল হয়ে পড়লে বাত ব্যাধি দেখা দেয়।

সভ্যতার আর একটি ক্ষতিকারক অবদান দ্রুতগতি যানবাহন। আজকাল স্থানান্তরে যেতে আর অঙ্গ সঞ্চালনের প্রয়োজন হয় না। কোন যানে চড়ে বসলেই হল। কিন্তু এর ফলে গ্রীবা ও পৃষ্ঠ দেশের মেরুদণ্ডে প্রতিনিয়ত ঝাঁকানি লাগে, তার ওপর আছে "হুইপ ল্যাশ" অপঘাত (whip lash injury) অর্থাৎ নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র অনুযায়ী গাড়ী হঠাৎ ব্রেক কষলে ঘাড়ে প্রচণ্ড ঝাঁকানি লাগে। পৃষ্ঠ দেশে এজাতীয় ঝাঁকানি বন্ধ করতে অনেক দেশে বাধ্যতা মূলকভাবে সিট বেল্ট পরতে বলা হয় কিন্তু গ্রীবা দেশের কশেরু বাঁচাবার কোন বন্দোবস্ত এখনও পর্য্যন্ত হয় নি। সুতরাং গ্রীবা দেশের মেরুদণ্ডে বাত ব্যাধি একটি অতিপরিচিত ঘটনা। অপিচ লক্ষণীয়, বিভিন্ন স্থানের কুলিদের মোট বহনের পদ্ধতি বিভিন্ন। কেউ মোট নেয় হাতে, কেউ নেয় কাঁধে, কেউবা মাথায়। আবার পাহাড়ী দেশে কুলিরা মোট মাথার ওপর না নিয়ে মাথা থেকে ঝোলান ষ্ট্রাপে ওজন বয়। এতে তাদের মেরুদণ্ডের বিভিন্ন স্থানের কশেরু ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে এবং পরে বাতব্যাধি দেখা দেয়।

অনায়াসসাধ্য পেশা এবং সুসভ্য জীবন যাত্রার জন্যে এই সব ব্যাধির প্রতিকার বর্বর জীবন বেছে নেওয়া নয়। উদাহরণ স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ পরিহাসের ছলে তাঁর "সে" উপন্যাসে বলেছিলেন" প্রকৃতির মূল মতলবটা শিশুদের কাছে শিখে নিতে হবে।...সবাই মিলে হামাগুড়ি দাও। ফিরে এস চতুষ্পদী

চালে, যদি দীর্ঘকাল ধরণীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাও।" শল্য চিকিৎসকরা বলবেন উপদেশটি সম্পূর্ণ গ্রহণ যোগ্য কারণ এটি বিজ্ঞান ভিত্তিক, কিন্তু বাস্তবে সম্ভব নয়। অনায়াস সাধ্য পেশার কুফল রোধের একমাত্র উপায় কাজের অবসরে ব্যায়ামাদির দ্বারা অঙ্গ সঞ্চালন করা এবং কয়েকটি বদভ্যাস পরিত্যাগ করা।

পেশা, মন ও মনোব্যাধি

অন্ন সংস্থানের তাগিদে মানুষকে অনেক সময় ইচ্ছার বিরুদ্ধে বৃত্তি বিশেষে নিযুক্ত থাকতে দেখা যায়, বিশেষ করে আমাদের মত বেকার সমস্যা জর্জরিত দেশে। সাধারণ বৃত্তির কথা বাদ দিলে সামরিক, আধা সামরিক, বৈমানিক ইত্যাদি পেশায় প্রচণ্ড শারীরিক ঝুঁকি আছে জেনেও অনেকে স্বেচ্ছায় এগুলিকে উপজীবিকা হিসেবে বেছে নেন এবং হয়ত দক্ষতার সঙ্গেই নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে যান, কিন্তু অবচেতন মনে মৃত্যুভয় বা অঙ্গহানির ভয় জনিত চাপটা থেকেই যায়। আবার অনেক সময় দেখা যায় প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন কাজে অকুশলী ব্যক্তি নিয়োগ করা হচ্ছে। তাছাড়া এক-ঘেয়ে কাজ করতে করতে দেহের সঙ্গে মনের ক্লান্তি আসাটাও কিছু বিচিত্র নয়, ফলে মধ্যে মধ্যে উপজীবীদের কার্যক্ষমতা ও দক্ষতা ব্যাহত হওয়াটা অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা।

স্বল্প বেতন ও তজ্জনিত সাংসারিক অশান্তি, ওপরওয়ালা বা সহকর্মীর সঙ্গে প্রকৃত অথবা কাল্পনিক মতানৈক্য ও মনোমালিন্য, চাকরিতে স্থায়িত্বের অভাব ইত্যাদি পরিস্থিতি আরও জটিল করে তোলে। এমতাবস্থায় উপজীবীরা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে পারেন, ফলে অবচেতন মনের চাপটা কাল্পনিক ব্যাধিরূপে প্রতিফলিত হতে পারে, যথার্থ ব্যাধির উপসর্গগুলি তীব্রতর হতে পারে কিম্বা সত্যি সত্যি তাঁরা বুক ধড়ফড়ানি (১নং তালিকায় "সৈনিকের হৃদরোগ" দ্রষ্টব্য) পেটের গোলমাল ইত্যাদি মামুলি ব্যাধি থেকে শুরু করে সোরায়েসিস্, (Psorasis) আলসারেটিভ কোলাইটিস (Ulcerative Colitis) ইত্যাদি মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে পারেন, বর্তমানে যে সব ব্যাধিকে সাইকো-সোম্যাটিক ব্যাধি (Psycho-somatic Illness) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। শ্রমিকদের মধ্যে স্নায়ু দৌর্বল্য যে কত ব্যাপক এবং তার জন্যে কাজের কী পরিমাণ ক্ষতি হতে পারে ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত রাসেল ফ্রেজারের (Russel Fazer) প্রতিবেদন থেকে তা জানা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বার্মিংহাম শিল্পাঞ্চলের তিন হাজার শ্রমিক নিয়ে

সমীক্ষা করে রাসেল দেখেছেন শতকরা দশভাগ শ্রমিকের মধ্যে রোগটি এত তীব্র যে তাদের পক্ষে কাজ চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং শতকরা আরও কুড়ি জনের মধ্যে রোগের প্রকোপ কম হলেও তাদের কার্যদক্ষতা ব্যাহত হয়। এই সব কারণে শ্রমিকদের শারীরিক পরিবেশের সঙ্গে মানসিক পরিবেশ নিয়েও ইদানীং কালে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়েছে। এক কথায় "man-hour" এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার এবং সুষ্ঠু উৎপাদন অব্যাহত রাখতে হলে শ্রমিকদের job satisfaction একান্ত প্রয়োজন।

অবশ্য এ কথাও সত্য যে কয়েকটি বিশেষ পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের অমানসিক কারণেও মানসিক অসুস্থতা সৃষ্টি হয়। উদাহরণ স্বরূপ ম্যাড হাটারের কথা আগেই বলা হয়েছে (প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) তাছাড়া রবার এবং রেয়ন শিল্পে ব্যবহৃত কার্বন ডাই-সালফাইডের (Carbon di-sulphide) বিষ ক্রিয়াতেও মনোবিকার ঘটতে পারে। আবার কিছু ভৌত কারণ শ্রমিকের মনের ওপর কুপ্রভাব বিস্তার করে। খনি শ্রমিক প্রভৃতি যাঁদের স্বল্পালোকে বা অভিনেতা ইত্যাদি যাঁদের তীব্র দৃশ্যালোকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করতে হয় এক সময় না এক সময় স্নায়ুদৌর্বল্যে আক্রান্ত হওয়াটা তাঁরা এড়াতে পারেন না। শ্রমিকের মনের ওপর শব্দের প্রভাব যে কত গভীর তার উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যে সব কলকারখানায় সব সময় প্রচণ্ড শব্দ হতে থাকে সেখানে অপঘাতের সংখ্যা বেশী ; কারণ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে এর জন্য দায়ী শ্রমিকদের সাময়িক মনঃসংযোগহানি। রোগীর মধ্যে রোগের বহিঃপ্রকাশ মানসিক না অমানসিক কারণে স্থির করতে বিশেষজ্ঞরাও হিমসিম খেয়ে যান। তাই আজকাল পেশাগত মনোবিজ্ঞান নিয়ে জোর গবেষণা চলছে এবং গবেষণার ফলে নতুন নতুন তথ্যও জানা যাচ্ছে।

অতি শৈশবকাল থেকেই উচ্চশ্রেণীর প্রাণীদের ব্যথার অনুভূতি দেখা যায়, কিন্তু ব্যথার অভিব্যক্তি সব মানুষের সমান নয়, সমপরিমাণ প্ররোচনায় কারুর ব্যথা হয় সামান্য, কারুর বা ভয়ঙ্কর (!)। এমনও দেখা গেছে কোন ব্যক্তির হয়ত গাড়ী চালাবার সময় দুর্ঘটনায় হাতের হাড় ভেঙে গেছে, তার পরেও নিজে গাড়ী চালিয়ে তিনি ডাক্তারের কাছে উপস্থিত হয়েছেন, আবার সামান্য ইনজেকশনের ব্যথাতে লোক অজ্ঞান হয়ে গেছে এও শোনা যায়। সুতরাং ব্যথার কারণ অনুসন্ধানের সময় চিকিৎসককে রোগীর মানসিকতা পর্যালোচনা

করে দেখতে হয় যে তাদের মধ্যে ব্যথার অভিব্যক্তি কী রকম। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ বাত ব্যাধি বা Spondylitis জাতীয় রোগ। এই বহুল প্রচলিত রোগের কারণ সম্বন্ধে দশম পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে এবং নিঃসন্দেহে এটি শারীরিক ব্যাধি, কিন্তু যে যন্ত্রণা রোগটির নিত্য সহচর তার সম্বন্ধে ফিলিপস্ ওয়াইলসের মত বহুদর্শী শল্যচিকিৎসক বলেন" Chronic low back pa n is a psychosomatic problem and whether the symptoms are slight or severe…it is very likely that sooner or later there will be psychological implication"* আমরা আগেই বলেছি কেরাণী, নির্বাহী ইত্যাদি অনায়াস সাধ্য পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের এ জাতীয় রোগ হয় বেশী এবং তাঁরা রোগ যন্ত্রণার জন্য যখন ডাক্তারের পরামর্শ চান তখন সেই উপসর্গ কতটা শারীরিক এবং কতটা মানসিক কারণে তা বিচার করে দেখতে হবে। রোগীর সঙ্গে বাক্যালাপ করে অনুমান করতে হবে তিনি কতটা পেশাগত মানসিক চাপে ভুগছেন এবং ব্যথাটা কতখানি এই মানসিক চাপের প্রতিফলন। সে ক্ষেত্রে পেশা বদল করলেই তাঁর যন্ত্রণা অনেক সময় নিরাময় হয়ে যায়, অন্তত বেশ কিছুটা কমে সহ্য সীমার মধ্যে এসে যায়।

শরীরের ওপর মনের প্রতিক্রিয়ার আর একটি উদাহরণ বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের পেশী বিশেষে টান ধরা। এর মধ্যে writer's cramp এর কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে এবং এও বলা হয়েছে যে এটি মোটামুটি মানসিক ব্যাধি। ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে র‍্যামাজিনি প্রথম রোগটির পুংখানুপুংখ বর্ণনা দেন। মনের সঙ্গে ব্যাধিটির সংযোগের কথাও তিনিই প্রথম উল্লেখ করেন। Diseases of scribes and notaries (মীর-মুন্সীদের ব্যাধি)-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন "But what tortures the workers most acutely is the intense and incessant application of mind, for in such work as this, the whole brain, its nerves and fibres, be kept constantly on the stretch, hence ensures loss of tonus." (শ্রমিকদের যা তীব্রভাবে নিপীড়ন করে সেটি হল গভীর এবং বহুক্ষণ স্থায়ী মনঃ সংযোগ, কারণ এই সব পেশায় সমগ্র স্নায়ুতন্ত্র সদাসর্বদা চাপে ভুগতে

* ঘিনঘিনে কোমরের ব্যথা মনোগত শারীরিক সমস্যা এবং ব্যথার উপসর্গ বেশী বা কম হোক, এক সময় না এক সময় এর মানসিক যোগসূত্র প্রকাশ পাবে।

ভুগতে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে)। পরে সার চার্লস বেল, গাওয়ার প্রমুখ স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞরা এ রোগের আরও প্রামাণ্য বর্ণনা দিলেও সকলেই একমত যে স্নায়ু দুর্বলতাই এর প্রধান কারণ। ছাত্ররা ব্যাপারটা সম্যক উপলব্ধি করবেন। পরীক্ষার সময় প্রশ্ন তৈরী থাকলে উত্তরপত্র লিখতে তাঁদের কোনই অসুবিধা হয় না। দু তিন ঘণ্টা একটানা লিখে যেতে পারেন ; মধ্যে মধ্যে ক্লান্তি দূর করার জন্য আঙ্গুল মটকে নিলেই হল। কিন্তু যদি শক্ত প্রশ্নের উত্তর ভেবে ভেবে লিখতে হয় তা হলে খানিকক্ষণ লেখার পরই হাতের পেশীতে টান ধরতে পারে, তার পর আর কিছুতেই স্বাচ্ছন্দ্যে লেখা যায় না। পরবর্তী গবেষণায় দেখা গেছে রোগটি টেলিগ্রাফ প্রেরক, টাইপিস্ট, উলবুনিয়ে, পিয়ানো-বেহালা আর সেতার বাদক ইত্যাদি অন্তত তিরিশ চল্লিশ রকম পেশায় যাঁদের সূক্ষ্মতা এবং দ্রুততার সঙ্গে অথচ স্বল্প পরিসর স্থানে অঙ্গুলি সঞ্চালন করতে হয়, তাঁদেরই হতে পারে। এও দেখা গেছে এঁরা সকলেই কুশলী এবং নিষ্ঠাবান কর্মী হন ; আর তা তো হতেই হবে, তা না হলে সূক্ষ্ম কাজগুলি করতে পারবেন কেন ?

মনের সঙ্গে পেশাগত আর্তির কী গভীর সম্বন্ধ কলকারখানায় অপঘাতের কারণ অনুসন্ধান করে তা প্রকাশ পেয়েছে। ১৯১৭ সালে ইংলণ্ডের "Industrial Fatigue Research Board" প্রথম এ ব্যাপারে সমীক্ষা শুরু করেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারনন বলেছিলেন যে কলকারখানায় যত অ্যাকসিডেন্ট ঘটে তার জন্য বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই কর্মসময়ের দীর্ঘতা, কর্মব্যস্ততা, অনভিজ্ঞতা এবং কর্মস্থলের তাপ আলোক ইত্যাদি সাধারণ পরিবেশ দায়ী। অপঘাত রোধ কল্পে অষ্টম পরিচ্ছেদে উল্লিখিত ব্যবস্থা সত্ত্বেও দুর্ঘটনার হার কমে শতকরা মাত্র 10 ভাগ। হাণ্টার বলেছেন "No matter how well working conditions may be controlled, such factors as the home life and psychological make-up of the individual worker will remain and become increasingly more important." (অবস্থা যতই আয়ত্বাধীন হোক না কেন, শ্রমিকের সাংসারিক পরিস্থিতি, মানসিক গঠন ইত্যাদির প্রভাব থেকেই যাবে এবং তীব্রতর হবে)। ১৯৩২ সালে ফারমার লক্ষ্য করেছিলেন যে একই পরিবেশে বহু শ্রমিক কাজ করলেও অপঘাত সংখ্যার তিন চতুর্থাংশ ঘটে বিশেষ

এক চতুর্থাংশ শ্রমিকের মধ্যে। তিনি এই ঘটনার নাম দেন "অপঘাত প্রবণতা" বা "accident proneness"। এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে ওই সব শ্রমিকদের মানসিক সংগঠনের ওপর। তাই আজকাল কলকারখানায় শ্রমিক নিয়োগের সময় তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার সঙ্গে মানসিক গঠনও পরীক্ষা করে নেওয়া শুরু হয়েছে ; অবশ্য কাজটা যে খুব শক্ত তাতে সন্দেহ নেই।

দেখা গেছে অপঘাত প্রবণ ব্যক্তিরা সাধারণত বেয়াদপ, অল্পে প্ররোচিত, অস্থিরমনা হয়ে থাকে। পারস্যুট মিটার (Pursuitmeter) বা ম্যাক্‌ডুগাল স্যুসটার ডজিং মেশিন (Mac Dugal-Schuster Dodging machine) দিয়ে পরীক্ষা করলেও অপঘাত প্রবণ ব্যক্তিত্ব ধরা পড়ে কারণ এই সব পরীক্ষায় কর্মীদের মনোসংযোগ, পেশীর সূক্ষ্ম এবং সুসংহত কর্মক্ষমতা ইত্যাদি বোঝা যায়। ব্যাপক সমীক্ষায় জানা গেছে অল্পবয়সী শ্রমিকদের অভিজ্ঞতার (Perceptual Cognition) অভাবে এবং বয়স্ক শ্রমিকদের পেশী সংহতির অভাবে অপঘাত ঘটে সবচেয়ে বেশী।

ব্যক্তিত্বে ওপর যেমন অপঘাত নির্ভর করে তেমনি অপঘাতের পরে শ্রমিকদের ব্যক্তিত্ব পরিবর্তিত হয়েছে তাও দেখা যায়। উনবিংশ শতাব্দীতে রেলগাড়ীর ব্যাপক প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে এতৎ সক্রান্ত পেশায় অপঘাত ঘটতে লাগল প্রচুর এবং আহত ব্যক্তিদের মধ্যে বিশেষ ধরণের স্নায়ু দৌর্বল্য (Railway Spine) দেখা যেতে লাগল। আপাত দৃষ্টিতে কোন কারণ ছাড়াই মেরুদণ্ডে ব্যথা এ রোগের প্রধান উপসর্গ এবং দেখা গেল বহু চিকিৎসাতেও রোগের উপশম হচ্ছে না অথচ যে মুহূর্তে রোগীর ক্ষতি পূরণের দাবী মেনে নেওয়া হল তখন অনেক সময় বিনা চিকিৎসায় রোগ সেরে গেল। আরও মজার ব্যাপার, খেলাধূলা করতে গিয়ে বা গৃহ কাজে আহত হলে এ জাতীয় ব্যক্তিত্ব পরিবর্তন দেখা যায় না। কিন্তু রোগটিকে "হিস্টিরিয়া" বলে উড়িয়ে দেবার আগে মনে রাখতে হবে মস্তিষ্কের আঘাত জনিত পোস্ট কনকাসানাল সিনড্রোম (Post Concusional Syndrome)-এও ব্যক্তিত্ব পরিবর্তন দেখা যায় এবং এটি একটি সাংঘাতিক শারীরিক আর্তি।

শ্রমিকদের মানসিক স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে শিল্পোন্নত দেশগুলিতে আজকাল ভৌত ও রাসায়নিক পরিবেশের সঙ্গে তাদের মানসিক পরিবেশের দিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে। মানসিক পরিবেশ বলতে প্রথমেই বোঝায় কর্ম-

স্থল। স্বাস্থ্যময় তো বটেই, এগুলি সুন্দর হওয়াও প্রয়োজন। তা ছাড়া ইদানীংকালের গবেষণায় জানা গেছে কর্মস্থল বাড়ীর কাছে হলে ভাল হয়। এবং এগুলি এমনভাবে তৈরী করা দরকার যাতে কয়েকজন সহকর্মী এক জায়গায় একসঙ্গে কাজ করতে পারে, তা'তে সহকর্মীদের মধ্যে একটা সামাজিক বন্ধন গড়ে উঠবে। চাষী, খনি শ্রমিক বা ধীবরদের এটা কোন সমস্যাই নয় কারণ তাদের সামাজিক এবং বৃত্তিজ পরিবেশ মোটামুটি একই। ফ্রোবার্গ (Froberg) এবং তাঁর সহকর্মীরা ১৯৭০ সালে বলেছেন স্কাণ্ডি-নেভিয়ায় চিরাচরিত অফিসঘরের পরিবর্তে তাদের উন্মুক্ততর স্থানে কাজ করতে বলায় তাদের মানসিক চাপ বেড়ে গেছল কারণ আর কিছুই নয়, উন্মুক্ত স্থানে গোষ্ঠীবোধের অভাব।

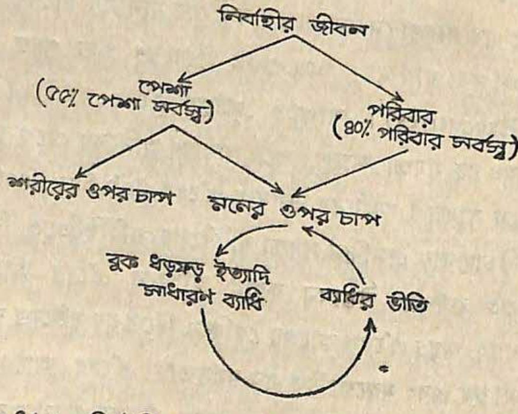
কর্মস্থলের পর আসে কর্মের সময়। বেশীর ভাগ পেশাতেই আজকাল দৈনিক আট ঘণ্টার শিফট্, মধ্যে 1 ঘণ্টার টিফিন বা মধ্যাহ্নভোজের বিরতি। তা ছাড়া সপ্তাহে যে কোন দেড় বা দু'দিন পূর্ণ ছুটি। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে যে পরিস্থিতি বরাবর এ রকম ছিল না। বহু শ্রমিক আন্দোলনের পর এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে। অবশ্য শ্রমিক কল্যাণ সংস্থাগুলিকে নজর রাখতে হবে শ্রমিকরা অবসর সময় স্রেফ ফূর্তি করে নষ্ট না ক'রে যাতে শরীর ও মনের উন্নতিতে ব্যয় করে। আমেরিকার বিখ্যাত শ্রমিক নেতা ওয়ালটার রুথার (Walter Ruther) ইউনাইটেড অটোমোবাইল কোম্পানীর শ্রমিকদের কর্ম-সময় সংক্ষেপের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিলেন তারা যদি এই উদ্বৃত্ত সময়টা হেসে খেলে, টেলিভিশন দেখে অতিবাহিত করতে চায় তার থেকে তাদের কাজ করাও ভাল। আজকাল এক নতুন প্রশ্ন উঠেছে শ্রমিকের মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে বাঁধাধরা কাজের সময় ভাল কী না। পঃ জার্মানীতে শ্রমিকের নিজস্ব সুবিধামত কাজের সময় নির্বাচনের সুযোগ দেওয়ার প্রথা পরীক্ষামূলক ভাবে চালু করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, নাইট শিফট্ এবং ওভার টাইমের কথা এসে যায়। সাধারণতঃ সদ্য বিবাহিত যুবকরা সাংসারিক অশান্তির ভয়ে নাইট শিফটে কাজ করতে চায় না, তা ছাড়া সবার ক্ষেত্রেই রাত্রে ঘুমের সময় ঘুম না হলে শারীরিক এবং মানসিক ক্ষতি হয়। অনেক সময় কিছুটা আর্থিক সাচ্ছল্যের জন্য কর্মীরা ওভারটাইম কাজ করে থাকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত এতে তাদের শারীরিক বা মানসিক ক্ষতিই হয়।

পেশা থেকে জীবিকা অর্জনের সমস্যা মূলত সামাজিক, এবং এর সঙ্গে মনের সম্বন্ধ নির্ভর করে সামাগ্রিক ভাবে দেশের অর্থনীতির ওপর। মাইনে যতই বাড়ুক না কেন ভোগ্য এবং বিলাস পণ্যের মূল্যের সঙ্গে যদি তার সংগতি না থাকে তবে শ্রমিক অসন্তোষ কিছুতেই মিটতে পারে না, শেষ পর্যন্ত একটা বিষচক্র স্থষ্টি হয়। মধ্যে "হায়ার পার্চেজ" প্রথা চালু করে সাময়িক ভাবে অসঙ্গতি দূর করবার চেষ্টা হয়েছিল বিলেতে, কিন্তু এতেও মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা যায় নি, বরঞ্চ বেড়ে গেছিল। বোনাস বা আর্থিক অনুদান সম্বন্ধে অনেকে বলেন এ সব উৎপাদন ভিত্তিক হওয়া চাই। কিন্তু এ সব সুযোগ সুবিধা না দিলে শ্রমিকরা উৎপাদনে অনুপ্রেরণাই বা পাবে কেন ?

কায়িক শ্রমিকরা ব্রাত্য, এমন একটা মনোভাব এখনও আমাদের দেশে চালু আছে এবং এর ফলে বহু শ্রমিক শত সুবন্দোবস্ত সত্ত্বেও হীনমন্যতাজাত মানসিক চাপে ভোগেন। সমাজ যদি কাজের উপযুক্ত মর্যাদা দেয় এবং কাজের পেছনে দেশপ্রেম ইত্যাদি জোরদার অনুপ্রেরণা (motivation) থাকে তবে যে কোন পরিস্থিতিতে যে কোন কাজে কর্মীরা আনন্দ পেয়ে থাকেন। কাজ যাতে ভাল লাগে তার জন্য কাজে বৈচিত্র্য দরকার। অবশ্য এক কাজের মধ্যেই যারা বৈচিত্র্য খুঁজে পান তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। তাই আজকাল একটা নতুন কথা শোনা যাচ্ছে Job Enlargement অর্থাৎ একজন শ্রমিককেই বিভিন্ন কাজের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া, যাতে নিয়োগের পর তাকে বিভিন্ন রকমের কাজ দেওয়া যায়।

কিন্তু এত সব ব্যবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও কর্মীদের মানসিক চাপের হাত থেকে পুরোপুরি রক্ষা করা যায় না। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ উচ্চ পদস্থ কর্মচারী বা নির্বাহীরা (Executives)। আপাত দৃষ্টিতে এঁদের কর্মজীবন মধুময় মনে হলেও এঁদেরও বহু সমস্যা আছে, তবে সাধারণ শ্রমিকের থেকে হয়ত স্বতন্ত্র। অনস্বীকার্য্য যে সাধারণ কর্মীদের তুলনায় এঁদের Job Satisfaction অনেক বেশী, কর্মপরিচালনায় দৈনন্দিন সমস্যা বা বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ সমস্যা সমাধান করতে কর্মপন্থা উদ্ভাবন করার অধিকার এঁদের আছে, বহুলোক এঁদের আজ্ঞাবহ অথচ এঁদের কাজের কৈফিয়ৎ দিতে হয় মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে। তবু এঁরাও মানুষ এবং মনুষ্যোচিত সব দুর্বলতাই এঁদের আছে। এ সম্বন্ধে পাঠকের যদি নিজস্ব কোন অভিজ্ঞতা না থাকে, তাঁদের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক

শঙ্করের লেখা "সীমাবদ্ধ" উপন্যাসটি পড়ে দেখতে অনুরোধ করব। ইংরাজী সাহিত্যের কৃতি ছাত্র শ্যামলেন্দু ঘটনাচক্রে এক বহুজাতীয় (multinational) কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কেরানীর চাকরী নিতে বাধ্য হল অর্থের জন্য। তার ছিল উচ্চাশা এবং সেই আশা সফল করবার মত জেদ ও কর্মদক্ষতা। তবু সেকস্‌পিয়ারের আত্মা মধ্যে মধ্যে তার বিবেককে নাড়া দিয়ে মানসিক চাপ বাড়িয়ে দিত। উচ্চাশার পথেও তার বাধা ছিল সহকর্মীর (রুনু সান্যাল) প্রতিযোগিতা ; তাই সে অফিসের কাজ করত নির্দিষ্ট সময়েরও বাইরে, রাত জেগে, কারণ তার প্রতিজ্ঞা তাকে স্ত্রী, পুত্র, শ্যালিকাকে অবহেলা করেও পদোন্নতি করতে হবে, অথচ কাজটা কত শক্ত। তার অধীনে যারা কাজ করে ব্যবহারের দ্বারা তাদের সহযোগিতা আদায় করতে হবে অথচ তাদের সঙ্গে মিশতে হবে ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে। এর পর আছে মালিককে লাভের মুখ দেখিয়ে খুশী করার প্রশ্ন শ্যামলেন্দু জানে ইংলণ্ডের বেনিয়া বোর্ড অফ ডিরেক্টরস তাকে বিলাস ব্যসনের যে উপকরণ দিচ্ছে তার পরিবর্তে লাভ চায়। ব্যবসা মানেই দেওয়ার থেকে নেওয়া বেশি, বেনে উল্টে দিলেও নেবে। এর জন্য তাকে যদি বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করতে হয় তাও হবে। তার পর আছে নিয়ম রক্ষা করতে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন। তবু শ্যামলেন্দুর সংসারে শান্তি ছিল, অনেক একজিকিউটিভের যা থাকে না। নির্বাহীদের জীবনযাত্রার আর একটা দিক যা শঙ্কর দেখান নি সেটা হল সময় নেই অসময় নেই পেশার খাতিরে বহির্ভ্রমণ এবং অবসর নেবার পর কী হবে তার চিন্তা।



চিত্র 31 : নির্বাহী পেশায় শরীর ও মনের মধ্যে দুষ্ট চক্র।

মনের ওপর চাপ সৃষ্টি করার পক্ষে উপরিউক্ত কারণগুলি একক ভাবে এবং বিষচক্রের মাধ্যমে যথেষ্ট কার্যকরী। তবে সুখের বিষয়, এই সব উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে চাপটা রোগের ভীতি হিসেবেই প্রতিফলিত হয় বেশী, ১৯৭১ সালে ইংলণ্ডে Registrar General এর সমীক্ষায় দেখা গেছে নির্বাহীদের সত্যি সত্যি অসুখ করে অন্যান্যের তুলনায় অনেক কম।

পরিশিষ্ট

(ক) ভারতীয় ফ্যাক্টরি আইন

বিভিন্ন কলকারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের কল্যাণের কথা চিন্তা করে ভারত সরকার ১৯৪৮ সালে 63 নং আইন (Factory act, 1948) পাশ করেন এবং ১৯৪৯ সালে ১লা এপ্রিল থেকে আইনটি সারা ভারতে বলবৎ হয়। পরে ১৯৭০ সালের 51 নং এবং ১৯৭৬ সালের 94 নং আইনে এগুলির কিছু কিছু সংশোধনীও গৃহীত হয়। এই আইনে মোট 120টি ধারা আছে যার বেশীর ভাগই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয়। যেমন 89 ধারার এক ও দুই উপধারায় বলা হয়েছে কোন শ্রমিক তালিকায় (schedule) উক্ত যে কোন পেশাগত ব্যাধিতে আক্রান্ত সন্দেহ হলে ফ্যাক্টরির ম্যানেজার এবং/বা সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কর্তৃপক্ষকে লিখিত ভাবে সে খবর দিতে বাধ্য। রোগের তালিকাটি নিম্নরূপ—

১। সীসা, সীসা ঘটিত পদার্থ অথবা সীসা যৌগের বিষক্রিয়া এবং তজ্জনিত ব্যাধি

২। সীসার টেট্রাইথাইল যৌগের বিষক্রিয়া

৩। ফসফরাসের বিষক্রিয়া এবং তজ্জনিত ব্যাধি

৪। পারদের বিষক্রিয়া " " "

৫। ম্যানগানিজের " " " "

৬। আর্সেনিকের " " " "

৭। নাইট্রাস ধোঁয়ার " " " "

৮। কার্বন-ডাই সালফাইডের বিষক্রিয়া

৯। বেনজিনের বিষক্রিয়া (বা তৎ সদৃশ কোন বস্তু, এর নাইট্রো ও অ্যামাইডো যৌগ সমেত) এবং তজ্জনিত ব্যাধি

১০। ক্রোম ক্ষত বা তজ্জনিত ব্যাধি

১১। অ্যানথ্রাক্স।

১২। সিলিকোসিস

১৩। হ্যালোজেন বা হ্যালোজেনের সঙ্গে অ্যালিফ্যাটিক হাইড্রোকার্বন যৌগের বিষক্রিয়া

১৪। রেডিয়াম বা অন্যান্য তেজস্ক্রিয় পদার্থ অথবা রঞ্জেন রশ্মি জনিত শারীরিক ক্ষতি

১৫। চর্মের প্রাথমিক এপিথিলিওমা জাতীয় ক্যান্সার

১৬। বিষঘটিত রক্তাল্পতা

১৭। বিষঘটিত জনডিস্

১৯৭৬ সালে এই তালিকায় যুক্ত হয়েছে—

১৮। অয়েল একনি অথবা খনিজ তৈল বা ওই জাতীয় তৈল যৌগের সংস্পর্শে চর্মরোগ

১৯। বাইসিনোসিস

২০। অ্যাসবেসটোসিস

২০। পেশাগত বা স্পর্শজাত ডার্মাটাইটিস (বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ এবং রঙের সংস্পর্শে)। এদের দুটি পর্য্যায় (ক) প্রাথমিক প্রদাহী এবং (খ) অ্যালার্জি

২২। উচ্চ শব্দ জনিত বধিরতা।

এছাড়াও শ্রমিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ধারাগুলি হল :—

11 নং ধারায় কর্মস্থল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং ড্রেন, পায়খানা ইত্যাদি পূতিবাষ্প মুক্ত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 12 নং ধারায় শিল্পজাত আবর্জনা ও দূষিত পদার্থ নিষ্কাশনের কথা, 13 নং ধারায় কারখানাগুলিতে উপযুক্ত তাপ ও বাতাস চলাচল নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে। 14 নং ধারাটি যে সব শিল্পে ক্ষতিকারক ধূলিকণা বা বিযাক্ত গ্যাস উৎপন্ন হয় সে ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। এই অপদ্রব্যগুলি বাইরে বার করে দেবার জন্য উপযুক্ত যন্ত্রাদি (যথা exhaust fan ইত্যাদি) ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরই দু নং উপধারায় লেখা হয়েছে বদ্ধ স্থানে Internal Combustion Engine চালালে তার থেকে নির্গত ধোঁয়া যেন কর্মস্থলের বাইরে বার করে দেওয়া হয়। 15 নং ধারায় কর্মস্থলের বাতাসে উপযুক্ত আদ্র'তা নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিশ্রুত জল ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

17 নং ধারায় কর্মস্থলে উপযুক্ত আলোকের (প্রাকৃত বা কৃত্রিম) বন্দোবস্তের কথা বলা হয়েছে। 3 (ক) উপধারায় উৎসজাত বা প্রতিফলিত চোখ ঝলসান আলো এবং 3 (খ) তে ছায়ার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে (অষ্টম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) 21 থেকে 41 ধারাতে পেশায় বিভিন্ন অপঘাত প্রতিরোধ কল্পে ব্যবস্থাদির কথা নির্দেশিত হয়েছে। তার মধ্যে 23 নং ধারাটি বিশেষ ভাবে প্রণিধান যোগ্য। এতে রয়েছে "No young person shall work at any machine to which this section applies unless he has been fully instructed as to the dangers arising in connection with machine..." 11 নং পরিচ্ছেদে এই আইনটির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে 22 নং ধারার 2 নং উপধারাটিও দ্রষ্টব্য।

27 নং ধারায় তুলো ধোনার কাজে বালক ও স্ত্রীলোক নিয়োগ বারণ করা হয়েছে।

51-66 নং ধারায় শ্রমিকদের সাপ্তাহিক কাজের সময়, দৈনিক কাজের সময়, বিশ্রামের সময়, ছুটি, নাইট শিফট ইত্যাদির নির্দ্দেশ লিপিবদ্ধ আছে এবং প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে এগুলি যে পেশাগত ব্যাধির সঙ্গে যুক্ত তা আমরা 11 নং পরিচ্ছেদে আলাচনা করেছি। আমাদের দেশের আইনে কলকারখানায় নিয়োগের ক্ষেত্রে 15 বছরের কম বয়স্কদের বালক, 15 থেকে 18 বছর বয়স্কদের কিশোর এবং 18 বছরের উর্দ্ধে পূর্ণবয়স্ক বলে গণ্য করা হয় (2 নং ধারা দ্রষ্টব্য) এবং 66-67 নং ধারায় কলকারখানায় এদের নিয়োগবিধি আলোচিত হয়েছে।

(খ) পরিভাষা

[পরিভাষা সম্বন্ধে আমার মনে হয় কয়েকটি বহু পরিচিত প্রতিশব্দ ছাড়া অন্যান্য শব্দের ক্ষেত্রে প্রত্যেক লেখকের উচিত নতুন বাঙলা শব্দ চয়ন করা। তা হলে তাদের মধ্যে যদি আকর্ষনীয় কোন শব্দ থাকে, সেটি অন্যান্য পাঠক বা লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এবং এইভাবে ক্রমশ বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক লেখার একটা নিজস্ব ধারা আসবে। গ্রীক, ল্যাটিন ইত্যাদি প্রাচীন ভাষার কিছু শব্দ শুধু ইংরাজী বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধেই নয়, পরন্তু আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ করেছে। সেগুলির বাঙলা তর্জমা করতে যাওয়া নিরর্থক, বাঙলা হরফে লিখলেই যথেষ্ট। প্রধানত চলন্তিকা অভিধানের সাহায্য নিয়ে আমি যে আপাত নতুন শব্দগুলি পুস্তিকাতে ব্যবহার করেছি তাদের তালিকা দেওয়া হল। পাঠকের মতামত জানতে পারলে বাধিত হব।]

Absorbable Iron গ্রহণযোগ্য লৌহ
Accident Proneness অপঘাত প্রবণতা
Adaptation অভিযোজন
Aerosol বাতাসে দ্রবীভূত
Airtight বায়ুবদ্ধ
Alarm Reaction বিপদসংকেত প্রতিক্রিয়া
Allergen অ্যালার্জিকারক
Alveolus বায়ুথলি
Amorphus অনিবন্ধী
Anaemia রক্তাল্পতা
Anaerobic অক্সিজেন নিরপেক্ষ
Antitetanus টিটেনাস বিরোধী
Apoplexy সন্ন্যাস রোগ
Aromatic গন্ধযুক্ত
Arteriole অনুধমনী
Audible sound শ্রুতিগোচর শব্দ
Automation স্বয়ংক্রিয়তা
Background sound পশ্চাৎপট শব্দ
Blow pipe ফুঁ দেওয়ার নল
Bronchiole ক্লোম প্রশাখা
Bronchus ক্লোম শাখা
Bone Necrosis অস্থির পচন
Bottom নিতম্ব
Carcinogen ক্যান্সার উৎপাদক
Cell Division কোষ বিভাজন
Certified প্রত্যায়িত
Chauffer মোটরগাড়ী চালক
Chimney Sweeper চিমনী পরিষ্কারক
Cinnabar হিঙ্গুল
Clay Shoveler মাটি কাটিয়ে
Compressed air উচ্চচাপ বায়ু

Contact Sensitization স্পর্শ কাতরতা
Cosmic মহাজাগতিক
Cramp পেশীটান
Cutting Instrument ছেদক যন্ত্র
Decomposed বিযোজিত
Density ঘনত্ব
Dermis অন্তঃত্বক
Devolution প্রতিবর্তন
Diluted লঘুকৃত
Dim light স্বল্পালোক
Disruptive force বিচ্ছেদক শক্তি
Dissolved দ্রবীভূত
Electrocuted বিদ্যুৎপৃষ্ঠ
Electro magnetic তড়িৎ চুম্বক
Element মৌল পদার্থ
Endocrine gland অন্তক্ষরি গ্রন্থি
Epidemic মহামারী
Epidermis ত্বনছাল
Erector spinae মেরুদণ্ড প্রসারী পেশী
Executive নির্বাহী
Expired air নিশ্বাস বায়ু
Feudal Lord সামন্তরাজ
Fibrous Tissue তন্তুকলা
Fireman দমকল শ্রমিক
Fish handler মেছুড়ে
Flint চকমকি পাথর
Flourescent অনুপ্রভ
Fore brain গুরুমস্তিষ্ক
Formula সংকেত
Functional Residual Volume কার্য্যকরী জমা বাতাস
Glare অত্যুজ্জ্বল আলোক, চোখ ঝলসান আলোক
Graphite কৃষ্ণসীসা
Haemorrhagic রক্তক্ষরী
Heat stroke লু, সর্দ্দিগর্মী
Helmet শিরস্ত্রাণ
High Pitched Sound উচ্চগ্রামের, উচ্চপর্দার শব্দ
Homeostasis সুসমঞ্জস্য স্থিতাবস্থা
Hamo-sapiens বর্তমান মানুষ (জ্ঞানী মানুষ)
Horny Cell layer of skin চর্মের বহিঃতম স্তর
Humid আর্দ্র
Hyperbaric Oxygen উচ্চচাপের অক্সিজেন
Implanted রোপিত
Incentive অনুদান
Infra Red অবলোহিত
Intensity of light আলোর ঔজ্জ্বল্য
Intensity of Sound শব্দের তীব্রতা
Infra Sound অবশব্দ
Initiating factor পরোক্ষ কারণ
Inorganic compound অজৈব যৌগ

Inspired air প্রশ্বাস বায়ু
Intermidiate host অন্তবর্তী আশ্রয়-দাতা
Iron deficiency anaemia লৌহ-ঘাটতি জনিত রক্তাল্পতা
Irritant Dermatitis প্রদাহী চর্ম-রোগ
Irritation, Inflamation } প্রদাহ
Insomnia নিদ্রাল্পতা
Insulated অন্তরীত
Ionized আয়নিত
Kidney বৃক্ক
Laboratory পরীক্ষাগার
Latent Period অন্তর্লীণ কাল
Leadglass সীসা মিশ্রিত কাঁচ
Lead Rubber apron সীসা মিশ্রিত রবারের বহির্বাস
Ligament সন্ধিবন্ধনী
Malty সীয়ান্বিত
Man Hour শ্রমদিবস
Mechanization যন্ত্রীকরণ
Mechanized Farming যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষ
Membrane Permeability কোষ আচ্ছাদনের ভেদ্যতা
Metalization ধাতুশিল্প
Metaloid উপধাতু
Metal Poison ধাতু বিষ
Milieu Interior অন্তঃ পরিবেশ
Motivation অনুপ্রেরণা
Mucus Membrane ঝিল্লি
Multi national বহুজাতীয়
Muscle co-ordination পেশী সংহতি
Muscle spasm, contraction পেশী সংকোচন
Mutation পরিব্যক্তি
Negative charge ঋণাত্মক আধান
Nervous system স্নায়ুতন্ত্র
Neurosis স্নায়ু দৌর্বল্য
Non Conductor বিদ্যুৎ কুপরিবাহী
Oil acne তৈল ব্রণ
Oncologist ক্যান্সার বিশারদ
Organic Compound জৈব যৌগ
Orthopaedic Surgeon অস্থি বিশারদ
Paralysis পক্ষাঘাত
Parasite পরজীবী
Penetrating capacity ভেদক ক্ষমতা
Perpetual cognition অভিজ্ঞতা
Pervaded পরিব্যাপ্ত
Physical Solution ভৌত দ্রব
Plaque মড়্মড়ি
Pleura ফুসফুসের আচ্ছাদন
Positive charge ধনাত্মক আধান
Progressive Massive Fibrosis ক্রমবর্ধমান ব্যাপক ফাইব্রোসিস্

Promoting factor প্রত্যক্ষ কারণ
Pulsating স্পন্দিত
Quartz স্ফটিক
Radiation বিচ্ছুরণ
Radiation Hazard রেডিয়েশন জনিত বিরূপ প্রতিক্রিয়া
Radio Isotope কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় মৌল
Refractories তাপরোধক ইটের কারখানা
Residual volume জমা বাতাস
Respiratory unit শ্বসন একক
Rotating crop চাষের জন্য জমি পরিবর্তন
Sacrum ত্রিকাস্থি
Saturnism শনির দশা
Sedantary occupation অনায়াস সাধ্য পেশা
Sensitizing সুবেদী
Scrotum অণ্ডথলি
Serum রক্তরস
Sign manual স্বাক্ষর
Spectrum বর্ণালী
Spinal cord সুযুম্না কাণ্ড
Stage of Exhaustion পরিশ্রান্ত পর্য্যায়
Stage of Stimulation উদ্দীপনা পর্য্যায়
Stress and Strain চাপ ও পেষণ
Striptease dancer নির্মোক নর্তকী
Synthetic chemicals সংশ্লেষিত রাসায়নিক
Technological Society প্রযুক্তি নির্ভর সমাজ
Tendon কণ্ডোরী
Thickness বেধ
Tidal volume সতত সঞ্চারমান বায়ু
Total lung volume মোট ফুস-ফুসের বাতাস
Trachea ক্লোম নালী
Ultra sonic অতিশব্দ
Ultra-violet অতিবেগুনী
Urinary Bladder মূত্রাশয়
Urinary Tract বহিঃমূত্র পথ
Urticaria আমবাত
Venule অনুশিরা
Vertebra কশেরুকা
Vibrating কম্পমান
Vicious cycle বিষচক্র
Visible দৃশ্যমান
Vital Capacity সঞ্চার বায়ু
Volatile উদ্বায়ী
Wart আঁচিল
Wave length তরঙ্গ দৈর্ঘ্য